সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

অক্টোবর ২০১৫

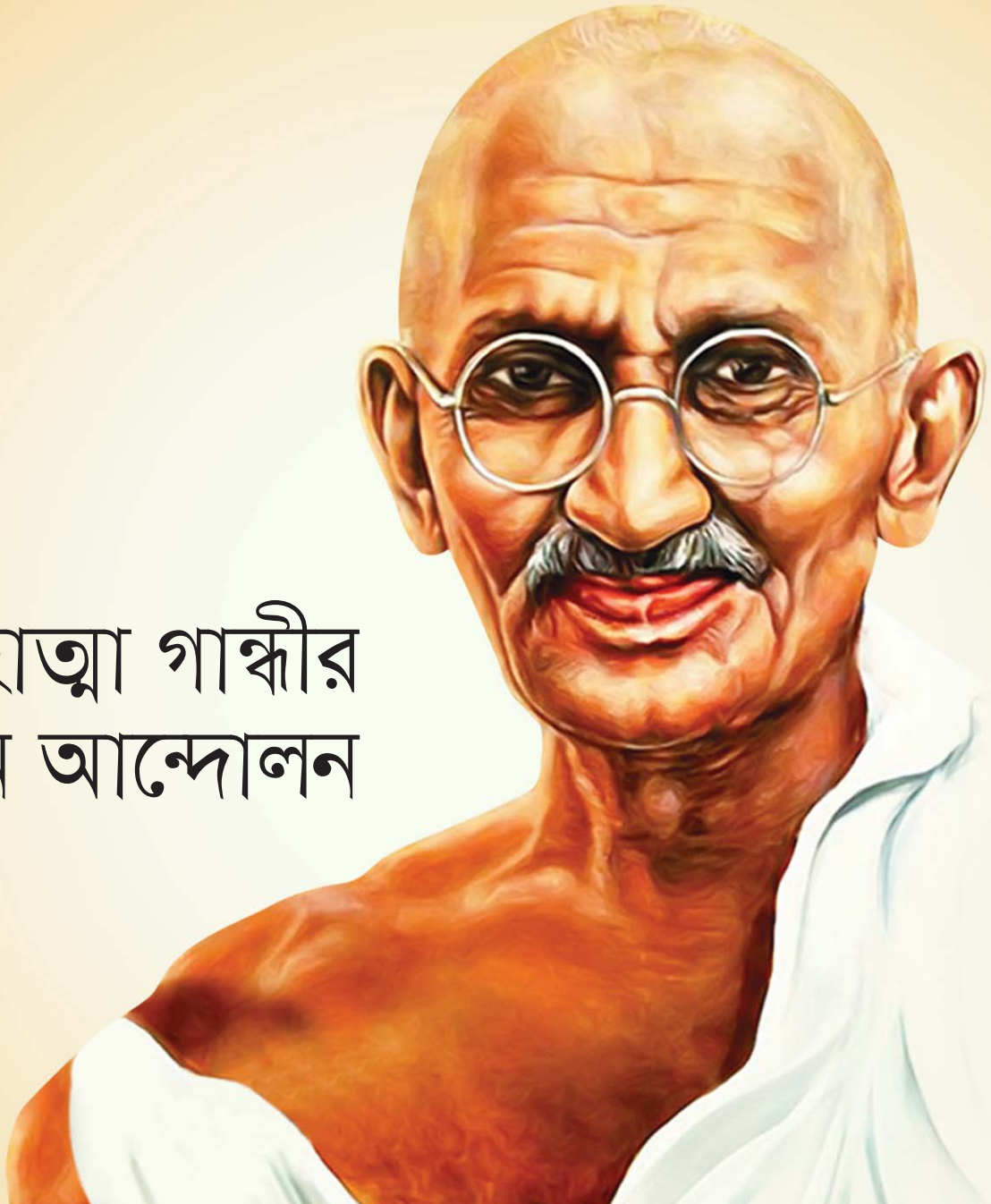

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন

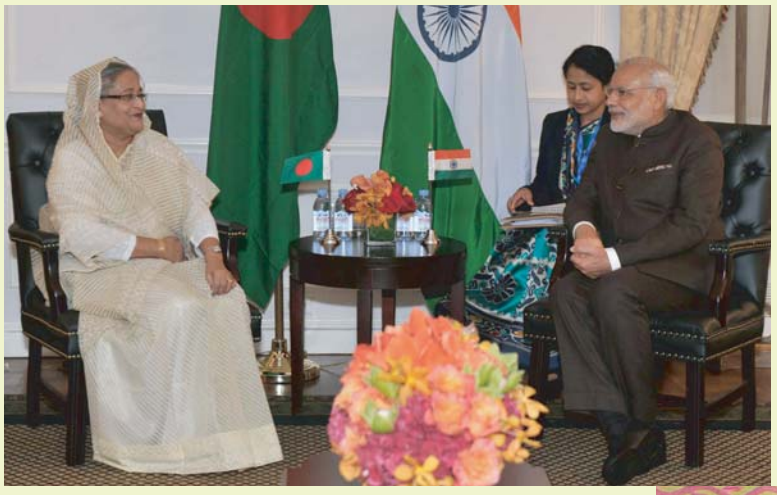

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউ ইয়র্কের ইউএনজিএর ৭০তম অধিবেশনে যোগদানকালে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মুদির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের সাবেক ছিট মহলের বাসিন্দাদের অস্থায়ী ভ্রমণ ও পরিচয়পত্র প্রদান করছেন ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ভারত্ব বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রযোজনায় 'গঙ্গাযমুনা নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৫'য় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাকায় বঙ্গভবনে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সঙ্গে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ সরন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ তেতালিশ | সংখ্যা ১০ | আশ্বিনকার্তিক ১৪২২ | অক্টোবর ২০১৫

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre
Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

ভারতে ঈদ উৎসব

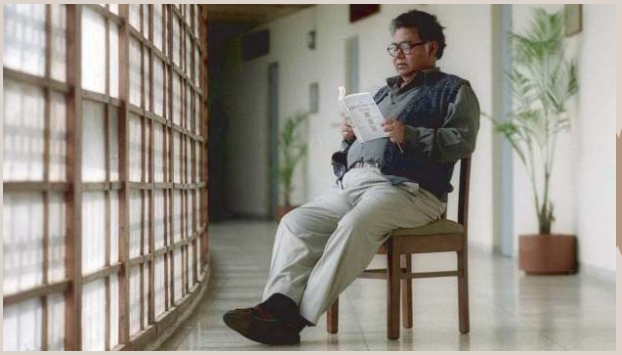

সুনীলে সুনীল তুমি

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে যখন শক্তি ও সুনীল উভয়ই অতিক্রম করছেন জীবনের মূল্যবান পঞ্চাশতম বর্ষাবস ন্ত– তখন শক্তি পেয়ে গেছেন *আনন্দ* ও *একাডেমি পুরস্কার* এবং সুনীল পেয়েছেন *আনন্দ* ও *বঙ্কিম পুরস্কার*। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান দুই কবি ইতোমধ্যে জীবনাচারে সৃষ্টিতে প্রায় কিংবদন্তিতুল্য হওয়ায় তাদের ঘিরে চলছে নিত্য পুরস্কার ও সংবর্ধনা দেওয়ার পালা। এই উপলক্ষে সে সময় *দরবারী সাহিত্যর* আ য়োজনে শক্তি ও সুনীলকে আলাদাভাবে দু'টি সংবর্ধনা ও দু'টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়– শক্তি এবং সুনীল সংখ্যা ১৩৯০। এই সংখ্যা দু'টি প্রমাণ করবে (লেখক তালিকা অনুযায়ী) এ সময় তাঁরা কতটা সমৃদ্ধ, জনপ্রিয় ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি ছিলেন, তুলনীয় হচ্ছিলেন যে-কোন তাবড় কবিদের সঙ্গে। সংখ্যা দুটোর তারকাখচিত লেখককবি দের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, রত্নেশ্বর হাজরা, সমরেশ মজুমদার, সাধনা মুখোপাধ্যায়, জীবন সরকার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্রবধূ ০৪
আমাদের বটতল আমাদের পড়াপুট ১০
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ১৪
ছোটগল্প: ভবঘুরের ভালবাসা ২০
কবিতা ২৪
সুনীলে সুনীল তুমি ২৬
অনুবাদ গল্প: ঠাকুরদা ও ঠাকুমার বিয়ের গল্প ৩০
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ৩৩
মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন ৩৯
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৪৩
ভারতে ঈদ উৎসব ৪৬
শেষ পাতা: শচীন দেববর্মণ ৪৮

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮০২৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

কপি চাই

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাহারা আজহার সংস্কৃত কলেজে *ভারত বিচিত্রার* একটি করে কপি চাই– যাতে বিশাল ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের এ সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়।

শিখা রাণী শীল, অধ্যক্ষ
সাহারা আজহার সংস্কৃত কলেজ
ধাতীশ্বর, নাঙ্গলকোট
কুমিলা-৩৫৮০

নিয়মিত পাঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের সকল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী *ভারত বিচিত্রার* নিয়মিত পাঠক। এ বিভাগের লাইব্রেরির পাঠকদের জন্য সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* সৌজন্য সংখ্যাগুলো নিয়মিত আসছে না। তাই আমাদের লাইব্রেরির জন্য *ভারত বিচিত্রা* পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

ড. মলয় বালা, চেয়ারম্যান
প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লোভে পড়েছি

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মানিকনগর আইডিয়েল বিএম কলেজটি একটি সমৃদ্ধ কলেজ। এ কলেজের লাইব্রেরিতে *ভারত বিচিত্রার* মত একটি তথ্যবহুল পত্রিকা পাঠালে শুধু লাইব্রেরি নয়, শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরাও সমৃদ্ধ হবেন। বন্ধু সায়েম মাহবুবের আলোচনায় পত্রিকাটি সম্পর্কে শুনে রীতিমত লোভে পড়েছি।

মাঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অধ্যক্ষ
মানিকনগর আইডিয়েল বিএম কলেজ
মানিকনগর, ঢাকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াণে

সমীররঞ্জন শীল

বরেণ্য কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আর ভুগবেন না ত্রিতাপ জ্বালায়,
ঘুমের মাঝেই গেলেন চিরনিদ্রায়
বাঙালি পাঠকদের ভাসিয়ে অশ্রুজলে।
অনেক লেখা লিখেছেন দীর্ঘকাল,
গদ্যেপ দ্যে স্বনামে-বেনামে সৃষ্টি করেছেন মায়াজাল
লিখেছেন ঢের শীলঅশীলের দোলাচল
তবু পাঠক ধন্য ধন্য বলে মালা দেন তাঁর গলে।
রাজনীতির প্রশ্নে বাঙালিসমাজ
ডানবা মের প্রতিষ্ঠার তরে তোলে বেসুরো আওয়াজ
হিংসা-দ্বন্দ্বের নকশালী মুণ্ডুপাতের কাজ
রক্তধারার মত এসে মিলায় গঙ্গাজলে।
তারই প্রতিক্রিয়া দেখি কলমের আগে–
মহাপ্রভুর দেশে লিপ্ত হয় কারা মাওবাদী অনুরাগে
শান্তি শৃঙ্খলা ফেরাতে আগায় সর্বাগ্রে
সহাবস্থানের শান্তির পথে সকলে মিলে।
কৃত্তিবাস ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনায়
বারোমাসে তেরপার্বণের এই বাংলায়
সত্যন ন্যায়ের ধ্বজা তুলে সমাজ প্রতিষ্ঠায়
ব্যর্থ হয়েছেন প্রতিরোধের বেড়াজালে।
বাঙালির আজ বিশ্বজুড়ে বসবাস
রবীন্দ্রনাথের 'দিবে আর নিবে'র সার্থক প্রয়াস
সবার পরশে পবিত্র করার স্থির বিশ্বাস
কালির অক্ষরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে হাসির কলরোলে।
সমাজসংসার মি ছে হয় ক্ষমতার পদাঘাতে
সুনীল আকাশে সূর্য ওঠে নিত্য প্রভাতে
শারদীয় পূজার ঢাক বাজে কাঠির কশাঘাতে
আবহমান বাংলার সীমাহীন আনন্দ উত্‌রোলে।
মিথ্যা হয়ে যায় সকল সাধনা
কাব্যসাহিত্য দর্শন কেউ মানে না
লোভের রাজ্যে শুধু কথার আলপনা
ভোগবাদী দর্শনের জটিল জটাজালে।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশস্তি গাই–
মার্কসবাদী দর্শনের ব্যর্থতার তুলনা নাই
মধ্যপন্থী হয়ে জাতধর্মের বাস্তবতাই
'সবার উপরে মানুষ সত্য' চণ্ডীদাস গেছেন বলে।

মামাবাড়ির টান

'হে' বইমেলায় এসেছেন বিক্রম শেঠ ঢাকায়
তাঁর মামাবাড়ি ছিল বাংলাদেশের খুলনায়
বাঙালিমাত্রই তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর খ্যাতি বিস্তর।
বাংলা একাডেমি ভবনে এই মহতী সম্মেলন
কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধনে
বিলীন হচ্ছে নানা ভাষাভাষীর মধ্যে যত ব্যবধান
বাস্তবতার প্রদীপের আলোয় হোক ভাস্বর।
'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই–'
শতাব্দী পার হলেও রবীন্দ্রনাথ সফল হন নাই
ঐকতানের মধুর সুরে রামধুন বাজায় বিসমিলা খাঁর সানাই
আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন এখনও দুস্তর।

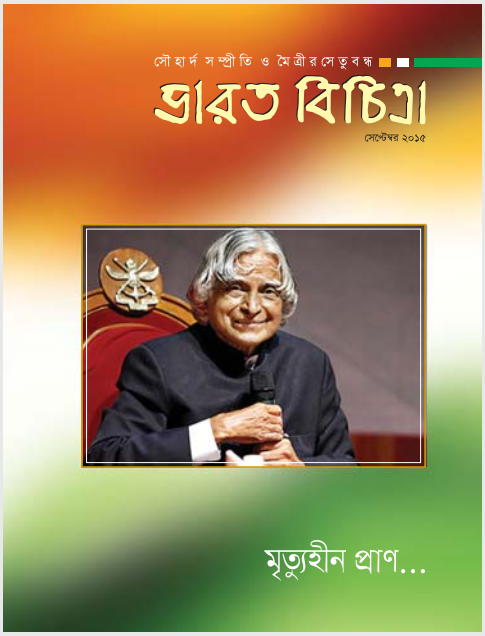

চিন্তা-চেতনার রঙতুলি ও কলমের আগায়
মনের সৃষ্টি মূর্ত হয়ে ওঠে নব নব ব্যঞ্জনায়
উদার চিত্তে লাগে দোলা বসন্ত হাওয়ায়
আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানির ছুঁয়ে যায় অন্তর।
তুমি খুঁজেছ রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে
শ্রদ্ধা জানিয়েছ কুষ্টিয়াতে লালন শাহে–
পদ্মার ইলিশে রসনা তৃপ্ত করেছ গভীর আগ্রহে
কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর।
ঋষি অরবিন্দ প্রফুলচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন
আরো আছে রূপসা, ভৈরব, কপোতাক্ষবিধৌত সুন্দরবন
খান জাহান আলীর জনকল্যাণে বিপুল অবদান
সাক্ষাৎ যমের দোসর রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
হেমন্তের শিশিরস্নাত প্রভাতে সোনার ধান
মিষ্টি রোদে দুলে দুলে জানায় নবান্নের আহ্বান
অভাব দৈন্য দূরে যাবে নূতন আশায় জাগবে প্রাণ
কবি জারি পুঁথি পাঁচালীতে মত্ত চরাচর
আম কাঁঠাল কলা পেয়ারা আনারস জাম্বুরা
আখ কমলা তেঁতুল করমচা ও আমড়া–
লেবুর গন্ধে প্রাণ জুড়ায় পুকুর ডোবাতে মাছ ভর ভর।
সন্ধ্যা নামিবে পলীমাঝে মন্দিরে বাজবে শাঁখ
তুলসীতলায় প্রণাম জানাবে বাজবে কাঁসর ঢাক
লুঠের বাতাসা বিলাতে দাদু দেবেন হাকডাক
মাগরিবের আজানে ভেসে আসে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর।
গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়বে সমগ্র পাড়াখান
বাঁশবনে শোনা যাবে হুতোম প্যাঁচার গান
খেজুরের রস পান করে তৃপ্ত বাদুড়ের প্রাণ
এমনি করেই বসত করে হেথা
হিন্দুমুসলিম- বৌদ্ধ খ্রিস্টান পরস্পর।
হেথায় তোমার মাতৃভূমি আজো প্রাণচঞ্চল
বঙ্গজননী বিছায়ে দিয়েছে তার শ্যামল অঞ্চল
সৃষ্টিকর্তার কাছে কামনা করি তোমার মঙ্গল
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে মধুর।

[সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি]

সমীররঞ্জন শীল
নিকেতন, ঢাকা

সম্পাদকীয়

এবার বাদল ছিল দীর্ঘকালীন। আষাঢ়-শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র গেল, আশ্বিন গেল, তবু যেন বর্ষণের বিরাম নেই। আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলছে, আর ক্ষণে ক্ষণে দুষ্টু ছেলের মত এক পশলা বৃষ্টি এসে সবাইকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ জীবনে বিশেষ করে এখন যে-সব মাঠে ধান লাগানো হয়েছে, সেখানে এই বৃষ্টি আশীর্বাদের মত কিন্তু নাগরিক জীবনে এ এক বড় অস্তস্তি, বিশেষ করে আমরা যারা এখন ছাতা বহন করা ভুলতে বসেছি। তবু এর মধ্যে অকালবোধনের বাদ্যি বেজে উঠেছে। আমাদের ঘরে আসবেন বলে পার্বতী মেঘালয় ছেড়ে সমতলে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর সংবর্ধনায় শিউলি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে আঙিনা। মাঠে মাঠে কাশফুলের শুভ্র হাসি উঠেছে ঝিকমিকিয়ে। মা আসছেন, প্রকৃতিতে তার প্রস্তুতি তো জাগবেই। এবার দেবী ঘোটকবাহিত হয়ে আসছেন, বিদায় নেবেন দোলায় চেপে। দেবীর আগমন ও নির্গমনের কাল বেশ দোষাবহ, তাই অশান্তির শংকা মনে জাগছে।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষটিকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনায় অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন হিন্দুরা তর্পণ করে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর পূজা হয়। এবারের দেবীপক্ষ নির্বিঘ্নে কাটুক– আশংকার কালো মেঘ টুটে যাক– জগতের সবাই সুখী হোক, মঙ্গল লাভ করুক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিন পুত্রবধূকে নিয়ে এবারের প্রধান রচনা। এঁরা হলেন যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী ও মৃণালিনী দেবী। এঁরা এসেছিলেন সামান্য পরিবার থেকে, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বিশাল প্রেক্ষাপটে এঁরা নিজেদের যেমন গড়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে নিজেদের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করতে পেরেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী নারী-স্বাধীনতা পথিকৃৎ। আজকের আধুনিক শাড়ি পরবার ধরনটি তাঁরই উদ্ভাবিত। ছেলেমেয়ের জন্মদিন পালন করে বঙ্গদেশে সাড়া জাগালেন, শিশুদের জন্যে পত্রিকা বের করলেন, ফটোগ্রাফির চর্চা করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। বিকেলে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে। অন্যদিকে কাদম্বরী ছিলেন খুব মিশুকে আর সাহিত্যপ্রেমী। নিজে কবিতা লিখতেন না, তবে কবি বিহারীলালের খুব ভক্ত ছিলেন, ছোট দেবরটিকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করতেন। মৃণালিনী ছিলেন ঠাকুর-জমিদারির এক গোমস্তাকন্যা। কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে এসে তিনি ক্রমে হয়ে উঠলেন সকলের আশ্রয়স্থল। আজ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে জগৎ-জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটির সূচনালগ্নে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে নিজের সমস্ত গয়না বিক্রি করে টাকা তুলে দিয়েছিলেন স্বামীর হাতে– স্বামীটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি।

প্রবন্ধ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্রবধূ

মিলি চট্টোপাধ্যায়

নবজাগরণের আলো প্রভাত সূর্যের আলোর মত পশ্চিম থেকে এসে ছাড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব দিগন্তের তটে। আর সেই আলোয় আলোকিত হয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল আমাদের নবযুগের ভিত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে নব্য রেনেসাঁর জাগরণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল একাই একশো। শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতি ও আচার-আচরণে অগ্রণী রূপকথার মত রহস্যেঘেরা এই বাড়িটি আজও বাংলাদেশের লোকের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। এই পরিবারে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর বাবা-দাদারাই নন, বাড়ির মেয়ে-বউরাও নবজাগরণের হাওয়ায় পাল তুলে এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেক দূর পর্যন্ত। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের কারো কারো অবদানও অসামান্য। আজ আমরা ঠাকুরপরিবারের তিন পুত্রবধূর ওপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব– এঁরা হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী– রবীন্দ্রনাথের মেজ বউঠান; তাঁর পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী– রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান আর তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী।

মহর্ষি পরিবারের মেজবউ জ্ঞানদানন্দিনীর বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় গৌরীদান করেছিলেন সাত বছরের মেয়েকে। তখন গ্রামের পাঠশালায় সবেমাত্র তার অক্ষর পরিচয় হয়েছে। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসার। ভারতীয় স্ত্রী স্বাধীনতার পথিকৃৎও বলা যায় তাঁকে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বালিকাবধূটিকে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলনে আদর্শ ভারতীয় নারীরূপে গড়ে তুলতে। আর সব কাজে স্বামীর সহায়তা পেয়ে তীক্ষ্ণ, জেদী, একরোখা মেজাজের ও অনন্য প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর জ্ঞানদানন্দিনী মেয়েদের

জ্ঞানদানন্দিনী বঙ্গললনাদের দিয়েছিলেন একটি রুচিসম্মত সাজ। বোম্বাই গিয়ে প্রথমেই তিনি পরিত্যাগ করলেন সেই ওরিয়েন্টাল ড্রেস আর গ্রহণ করলেন পারসি মেয়েদের ছিমছাম শাড়ি পরবার ধরনটি। নিজের পছন্দমত একটু অদল-বদল ঘটিয়ে সুন্দর একটি রূপ দিলেন পরিচ্ছদের। সরলা দেবী চৌধুরানীর লেখায় পাওয়া যায় তাঁর মা স্বর্ণকুমারী ও মেজমামী দেশে ফিরেছিলেন নতুন ধাঁচের শাড়ি পরে। এখন থেকে ব্রাহ্মমহিলারাও এই ধাঁচের শাড়ি পরতে আরম্ভ করলেন। বোম্বাই থেকে এই ধারা নিয়ে আসবার ফলে ঠাকুরবাড়িতে এর নাম হয় 'বোম্বাই দস্তুর'। আর বাংলা দেশে এর নাম হয় ঠাকুরবাড়ির শাড়ি। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে এ ধরনের শাড়ি পরা দেখাবেন বলে জ্ঞানদানন্দিনী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক ব্রাহ্মিকা সেদিন এসেছিলেন শাড়ি পরা শিখতে। সবার আগে এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত।

অগ্রগতির পথ অনেকটাই খুলে দিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিলেন তাই নয়, সমসাময়িক পুরুষদের মনের বাধাও অনেকাংশে দূর করেছিলেন। দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অসম্ভব স্নেহ করতেন তিনি এঁকে। প্রথমদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রক্ষণশীল থাকলেও মেজদাদাবউদির সংস্পর্শে এসে হয়ে উঠেছিলেন বেশ নব্যপন্থী।

প্রথমবার বিলেত গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন স্বচ্ছন্দে, স্বাধীন, সাবলীলভাবে ঘোরাফেরা করা মেমসাহেবদের। তিনি চেয়েছিলেন স্ত্রীকেও বিলেত নিয়ে যেতে। কিন্তু সেবারে তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়নি। রাজী হলেন না মহর্ষিদেব। বাড়ির বউ রইলেন বাড়িতে। তাঁর পড়াশুনা নতুন করে শুরু হল হেমেন্দ্রনাথের কাছে। এদিকে দেবেন্দ্রনাথও বাড়ির মেয়েদের পড়াবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলে তাঁর কর্মস্থল হল মহারাষ্ট্র। আবার তিনি পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার। এবারে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। রাজী হলেন বাবামশায়। স্ত্রীকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যাবেন সত্যেন্দ্রনাথ। শুরু হয়ে গেল যাত্রার তোড়জোড়। কিন্তু মুশকিল হল অন্য জায়গায়। কি পোশাক পরে বাইরে যাবেন জ্ঞানদানন্দিনী! অন্তঃপুরিকারা তো তখন বাইরে বের হতেন না। তাই তাদের সাজপোশাক নিয়ে মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন পড়েনি। শুধু একখানি ভাল শাড়ি পরলেই চলত। নিজের পুরনো কথা বলবার সময় জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন যে শীতকালে তাঁরা ব্যবহার করতেন শাড়ির ওপর একখানি চাদর। যাহোক, তখনকার মত ফরাসি দোকানে ফরমাস দিয়ে তাঁর জন্য বানানো হল ওরিয়েন্টাল ড্রেস। এটি পরা ছিল খুবই কষ্টকর। তাই পরবর্তীকালে জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি মেয়েদের রুচিশোভন সাজ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। যার ফলশ্রুতি আজকের বাঙালি মেয়েদের সাজ। সে কথায় আমরা পরে আসছি।

এরই মধ্যে যাবার প্রস্তুতি তো শেষ। সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিলেন বাড়ি থেকেই তিনি সস্ত্রীক গাড়িতে উঠবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মত দিলেন না মহর্ষিদেব। অসূর্যম্পশ্যা গৃহবধূ কর্মচারীদের সামনে দিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠবেন– এতটা বোধহয় ভাবতে পারেননি তিনি। সাবেকী পালকিতে চড়েই বোম্বাইগামী জাহাজে গিয়ে উঠলেন ঠাকুরবাড়ির মেজবউ।

কিন্তু এই শেষ। এরপরে আর কোনদিন পালকি চড়েননি মেজবউ। দু'বছর পরে যে দিন তিনি অপরূপ বেশবাসে বাড়ি ফিরলেন সে দিনটা বাঙালি মেয়েদের কাছে এনে দিয়েছিল আলোর ইশারা। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাতে পাই, 'ঘরের বউকে সদরে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তা বর্ণনার অতীত'। বাড়ির কাজের লোকেদের চোখেও নেমে এসেছিল শোকের অশ্রুধারা। বাড়ির ভেতরেও অন্যান্য মেয়েরা স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে মিশতে অথবা খাওয়া-দাওয়া করতে ভয় পেতেন। বাংলাদেশের মেয়েদের কড়াকড়ি শিথিল হতে অনেক সময় লেগেছিল। ততদিন জ্ঞানদানন্দিনীকে সব লাঞ্ছনা একাই সহ্য করতে হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে তাঁর আচারআচরণ দুঃসাহসিক বৈকি।

এরপরে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে লাটভবনে গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সবাই প্রথমে তাঁকে ভেবেছিল 'ভূপালের বেগম'। তখন তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি বাইরে বের হতেন। পাথুরেঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরও ছিলেন সেই ভোজসভায় নিমন্ত্রিত। তিনি ঘরের বউকে প্রকাশ্য সভায় দেখে রাগে-দুঃখে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বাইরে বের হওয়া নিয়ে সে সময় এত হই চই হলেও এরপর থেকেই বাংলাদেশের মেয়েদের দরজা একটু একটু খুলতে আরম্ভ করল। এ সময় থেকেই ঘরের বাইরে অল্প অল্প করে পা রাখতে আরম্ভ করলেন অন্তঃপুরিকারা।

আগেই বলেছি জ্ঞানদানন্দিনী বঙ্গললনাদের দিয়েছিলেন একটি রুচিসম্মত সাজ। বোম্বাই গিয়ে প্রথমেই তিনি পরিত্যাগ করলেন সেই ওরিয়েন্টাল ড্রেস আর গ্রহণ করলেন পারসি মেয়েদের ছিমছাম শাড়ি পরবার ধরনটি। নিজের পছন্দমত একটু অদলবদল ঘটি য়ে সুন্দর একটি রূপ দিলেন পরিচ্ছদের। সরলা দেবী চৌধুরানীর লেখায় পাওয়া যায় তাঁর মা স্বর্ণকুমারী ও মেজমামী দেশে ফিরেছিলেন নতুন ধাঁচের শাড়ি পরে। এখন থেকে ব্রাহ্মমহিলারাও এই ধাঁচের শাড়ি পরতে আরম্ভ করলেন। বোম্বাই থেকে এই ধারা নিয়ে আসবার ফলে ঠাকুরবাড়িতে এর নাম হয় 'বোম্বাই দস্তুর'। আর বাংলা দেশে এর নাম হয় ঠাকুরবাড়ির শাড়ি। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে এ ধরনের শাড়ি পরা দেখাবেন বলে জ্ঞানদানন্দিনী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক

ব্রাহ্মিকা সেদিন এসেছিলেন শাড়ি পরা শিখতে। সবার আগে এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী গুপ্ত।

আমেদাবাদের প্রবাসকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিলেত গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তার আগেই দুই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে একাকিনী সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী। এ বিষয়েও তিনি বাঙালি মহিলাদের পথিকৃৎ। যে সময় পুরুষেরাই একাকী সমুদ্র পাড়ি দিতে ভরসা পেতেন না, সেই সময় কী দুঃসাহসিক কাজ করলেন তিনি! বিদেশে গিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি ঠিকই কিন্তু সেই স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। সাহেবিয়ানা নিজে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। একজন নারীর আত্মবিশ্বাসের জন্য যতটুকু পশ্চিমী রীতিকে গ্রহণ করা উচিত, ঠিক ততটুকুই নিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আরো পাওয়া যায় যখন তিনি বোম্বাই থেকে ফিরে আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উঠলেন না। স্বামীপ্রু ত্রকন ্যা নিয়ে অন্য বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। মহর্ষিদেব তাঁর এই মেজপুত্রবধূটিকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। তবু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তো করলেনই না, বরং পরিবারের সকলের সুখদুঃ খে, দরকারঅদরকা রে দুহাত বাড়িয়ে দিতেন জ্ঞানদানন্দিনী। প্রথমবার বিলেত গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উঠলেন মেজবৌঠানের কাছে; প্রফুলময়ী স্বামী-পুত্র হারিয়ে সান্ত্বনা পেলেন মেজদির কাছে; বালিকামাতা মৃণালিনীর প্রথম কন্যা মাধুরীলতার জন্মের পরে সুষ্ঠুভাবে সন্তানপালনের জন্য মেজদা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন; মাতৃহীন দুই পুত্রকন ্যাকে মেজবৌঠানের কাছে রেখে অসুস্থ মেয়ে রেণুকাকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনে গেলেন কবি; অবনীন্দ্রনাথকে আঁকার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন আবার প্রতিমা দেবীর জন্য আঁকবার মাস্টারমশাইও খুঁজে দিয়েছেন তিনিই; জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দিয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়েছেন; এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর *বালক* পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখতে উৎসাহিত করেছেন।

তবে শুধুমাত্র বড়দের জন্য নয়, ছোটদের কথাও ভেবেছেন জ্ঞানদানন্দিনী। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের জড়ো করে একটি পত্রিকা বার করলেন তিনি, নাম দিলেন *বালক*। সেই সময় ঠাকুরপরিবারের বধূদের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের চর্চা জ্ঞানদানন্দিনীই সর্বাধিক পরিমাণে করেছিলেন। সম্পাদিকা অবশ্য *বালক* পত্রিকায় লিখেছেন একটি মাত্র রচনা। তাও অনুবাদ। তবে শুধুমাত্র পত্রিকা প্রকাশ করা নয়, ছোটদের আঁকার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে তিনি নিজের বাড়িতে বসিয়েছিলেন 'লিথো প্রেস'। নাতি সবীরেন্দ্রের জন্য *সাত ভাই চম্পা* ও *টাকুড়মাড়ুম* নামে দু'টি রূপকথার নাট্যরূপ দিয়েছেন। এছাড়া *ভারতী* পত্রিকায় তাঁর লেখা তিনটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটির নাম 'কিন্টারগার্ডেন', দ্বিতীয়টি 'স্ত্রী শিক্ষা' ও তৃতীয়টি 'ইংরাজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ'। এছাড়া তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা একটি মারাঠি রচনার অনুবাদ তিনি করেছিলেন 'ভাউ সাহেবের বখর' নামে।

বেশবাসে আধুনিকতা আনা ছাড়াও আরও দু'টি বিদেশী জিনিসের তিনি প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে একটি হল জন্মদিন পালন ও অপরটি হল বিকেলে বেড়াতে যাওয়া। ঈঙ্গব ঙ্গ সমাজের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা থাক লেও অহেতুক সাহেবিয়ানা তিনি পছন্দ করতেন না। একবার বোম্বাই থেকে ফিরে এসে ফটোগ্রাফার ডেকে বাড়ির অন্দরমহলের শাশুড়ি, মা, ননদ ও অন্যান্য মহিলাদের ফটো তুলিয়েছিলেন তিনি। যা থেকে আজো আমরা ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের রূপ সম্বন্ধে একটা আভাস পাই। তাঁরা মানুষের মন থেকে একেবারে হারিয়ে যাননি। নিজের ছেলেমেয়েদের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালন করতেন তিনি। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে নিমন্ত্রণ করতেন। আর সমস্ত কাজের লোকদের সময়োচিত দরকারি জিনিসপত্র উপহার দিতেন।

ঘরেবাইরে সব কাজেই যেমন অগ্রণী ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ছিলেন তেমনই। ঠাকুরবাড়ির নাটকপাগল ছেলেদের নাটকের মহড়া হত তাঁরই বাড়িতে। আর নাটকের কুশীলবদের মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। নতুন করে লেখা হল *রাজা ও রানী* নাটক। ভূমিকাও ঠিকঠাক। রাজা বিক্রম রবীন্দ্রনাথ, রানী সুমিত্রা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, দেবদত্ত সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী মৃণালিনী দেবী, কুমার প্রমথ চৌধুরী ও ইলার ভূমিকায় প্রিয়ংবদা দেবী। এই নাটকের মহলাও হত জ্ঞানদানন্দিনীর বির্জিতলার বাড়িতে। নাটক জমেছিল দারুণ। এরপরে পাবলিক স্টেজে এই নাটকের অভিনয় হয়। আমন্ত্রিত হয়ে সেই অভিনয় দেখতে গিয়ে তো ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। অভিনয় সকলেই ভাল করেছিলেন কিন্তু যিনি সুমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি সাজসজ্জা, চলনবলন এমন কি গলার স্বরেও জ্ঞানদানন্দিনীকে নকল করেছিলেন।

সেই আমলে তিনি ফটোগ্রাফির চর্চা পর্যন্ত করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীর লেখায় দেখা যায়, "আমার মা প্রায় শতাধিক বছর আগে 'বোর্ন এন্ড শেফার্ড'এর কাছে ছবি তুলতে শিখে বাড়ির এমন সব লোকের ছবি তুলেছিলেন যাদের অন্য কোন ছবি নেই বা হবার সম্ভাবনাও ছিল না।" ফটোগ্রাফি বিষয়ে তাঁর উৎসাহের কথা আরও অনেকের লেখা থেকে জানা যায়। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের যোগাযোগ করিয়ে দেন জ্ঞানদানন্দিনী, যার ফলশ্রুতি বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের নবজাগরণ।

খুব আত্মীয়বৎসল ও আমুদে প্রকৃতির মহিলা জ্ঞানদানন্দিনী– সকলের সেবাযত্ন করতেন আবার সেইসঙ্গে ছিলেন তেজস্বিনী ও অভিমানিনীও। ১৯০৮ সালে রাঁচী বেড়াতে গিয়ে জায়গাটা তাঁদের খুব পছন্দ হয়ে যায়। তাই শেষ জীবনে মোরাদাবাদী পাহাড়টি কিনে, রাস্তা বানিয়ে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিধাম' বাড়ি বানালেন আর নীচে জ্ঞানদানন্দিনীস ত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের 'শক্তিধাম'। বাড়ি বানিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন তাঁরা।

খুব আত্মীয়বৎসল ও আমুদে প্রকৃতির মহিলা জ্ঞানদানন্দিনী– সকলের সেবাযত্ন করতেন আবার সেইসঙ্গে ছিলেন তেজস্বিনী ও অভিমানিনীও। ১৯০৮ সালে রাঁচী বেড়াতে গিয়ে জায়গাটা তাঁদের খুব পছন্দ হয়ে যায়। তাই শেষ জীবনে মোরাদাবাদী পাহাড়টি কিনে, রাস্তা বানিয়ে পাহাড়ের উপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিধাম' বাড়ি বানালেন আর নীচে জ্ঞানদানন্দিনী-সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের 'শক্তিধাম'। বাড়ি বানিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন তাঁরা।

রবির বয়স যখন সাত তখন বিশ বছরের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ হয় নয় বছরের বালিকা কাদম্বরীর। ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে এলেন আরেক প্রতিভাময়ী মহিলা। অতি আধুনিকমনস্ক সত্যেন্দ্রনাথের একটুও ইচ্ছা

ছিল না এইটুকু মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দিতে। কিন্তু 'একে ব্রাহ্ম তায় পিরালী', কাজেই মনের মত মেয়ে পাওয়া দায় হয়ে উঠল। তাই যাকে পাওয়া গেছে তার সঙ্গেই বিবাহ হল মহর্ষিদেবের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। কাদম্বরীর পিতামহ জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল দ্বারকানাথের মামাতো বোনের। তাই এই বিয়েতে কোন অমত ছিল না মহর্ষিদেবের। কাদম্বরীর পিতার নাম ছিল শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সকলের আশঙ্কা বিফল করে দিয়ে ঠাকুরবাড়ির যোগ্য বধূ হয়ে উঠলেন কাদম্বরী। রবীন্দ্রনাথের নতুনবৌঠান। নিজে তিনি কোন কিছুতে অংশ গ্রহণ করতেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর হাতের পরশমণির ছোঁয়ায় উজ্জীবিত করে তুলতেন সবাইকে। স্ত্রী সারদা দেবীর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর ছাদের ঘর এসে গেল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকারে। এই ছাদেই কাদম্বরী গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নন্দনকানন। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে বসত সান্ধ্যআসর। আসতেন অক্ষয় চৌধুরী, শরৎকুমারী (লাহোরিণী), স্বর্ণকুমারী, জানকীনাথ ঘোষাল। মাঝে মাঝে আসতেন তৎকালের বিখ্যাত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। আর এঁদের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ তো থাকতেনই। সান্ধ্যআসর ভরে উঠত গানে গল্পে সাহিত্যপাঠে। মাদুরের ওপরে তাকিয়া, রূপোর রেকাবি, ভিজে রুমালের ওপরে বেলফুলের মালা। বরফ জল, বাটাভর্তি ছাঁচি পান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজাতেন বেহালা আর রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরে গান। বাড়ির গৃহসজ্জাই বদলে দিলেন কাদম্বরী। ছাদের পিলারের ওপরে বসালেন নানা ধরনের ফুলের গাছ। এল নানান রঙের পাখি। কিশোর কবির মনের রঙকেও চড়া সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন তিনিই।

সারদা দেবীর মৃত্যুর পরে কাদম্বরীই মাতৃহীন বালকদের (সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ) মায়ের স্থান নেন। তখন তাঁর বয়স ষোল। এছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটমেয়ে ঊর্মিলাকেও মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন কাদম্বরী। কিন্তু মোটে পাঁচ বছর বয়সে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শোচনীয় মৃত্যু হল তার। কাদম্বরীর বয়স তখন প্রায় একুশ।

বিবাহের সময় সম্ভবত কাদম্বরীর অক্ষরপরিচয়ও ছিল না কিন্তু তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহিত্যপ্রেমী, অসাধারণ ছিল তাঁর সাহিত্য-বোধ। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের যা কিছু দান তার অনেক কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কাদম্বরীর নাম। এমন কী কিশোর কবির মনোগঠনেও তাঁর অবদান অনেক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী মাঝেমাঝেই হাওয়া বদল করতে যেতেন গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়িতে। কলকাতায় থাকলে বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের সঙ্গী হতেন রবীন্দ্রনাথ। নীলের ব্যবসায়ী মোরান সাহেবের বাগান বাড়িতে কর্মহীন আলস্যে নতুনদাদা আর বৌঠানের সঙ্গে দিনযাপনের স্মৃতি কবির মনে অক্ষয় হয়ে থেকেছে। *জীবনস্মৃতি*তে কবি লিখেছেন, 'আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকাশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।... কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম।... এক একদিন রান্নার আয়োজন বকুল গাছতলায়। সে রান্নায় মশলা বেশী ছিল না, ছিল হাতের গুণ।... সেই সময়কার অন্তরঙ্গ গার্হস্থ্য ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর এই বর্ণনায়, যার মধ্যে নামোচ্চারণ না করেও কাদম্বরীর উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এ ছাড়াও অনেক সময় অনেক কাব্য, কবিতায়, গদ্যে, পত্রে কবি স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর এই প্রিয় বৌঠানের। রানী চন্দকে বলেছেন, 'গঙ্গা সাঁতরে তখন এপার ওপার হতাম। নতুন বৌঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। কত বেড়িয়েছি নতুন বৌঠান আর আমি। বনে জঙ্গলে কুল পেড়ে খেয়েছি।... খুব ভালবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতেন। এই ভালবাসায় নতুন বৌঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন।'

অন্দরমহলে কাদম্বরীর আরেকটি গুণের কথাও বিশেষ ভাবে বলবার মত। তিনি ছিলেন সুগায়িকা ও সুঅভিনেত্রী। সঙ্গীতজ্ঞ জগমোহন গাঙ্গুলির নাতনি ছিলেন কাদম্বরী। সঙ্গীত ছিল তাঁর রক্তে। ইন্দিরা দেবী ও সরলা দেবীর মত সঙ্গীতে অসামান্য পারদর্শী দুই মহিলাও তাঁদের স্মৃতিচারণে তাঁর প্রশংসা করেছেন। স্বর্ণকুমারী লিখলেন *বসন্ত উৎসব*। গীতিনাটিকা লেখার সূচনা করলেন তিনি। এ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া আসরে। গানও গেয়েছিলেন তিনি এতে। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফেরবার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা *মানময়ী* নাটকের অভিনয় হয় জোড়াসাঁকোয়। এতে প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী। এরপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উজ্জীবিত হয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন আরো নাটক। নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থাও হল। এখন তো ঘরোয়া পরিবেশে বাড়ির মেয়েদের অভিনয় করতে তেমন বাধা নেই। মঞ্চসফল নাটক *এমন কর্ম আর করব না* অনুষ্ঠিত হল ঠাকুরবাড়িতে। নাটকে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবু, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যসন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চীনেম্যান, অলীকের বন্ধু অরুণেন্দ্রনাথ, শরৎকুমারীর স্বামী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় গদাধর, পিমণি বা প্রসন্নদাসী সেজেছিলেন বর্ণকুমারী দেবী। আর নাটকের সবচেয়ে দুরূহ চরিত্র হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন কাদম্বরী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ভগ্নহৃদয়* কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন 'শ্রীমতী হে'কে। এই 'শ্রীমতী হে' যে কে তা নিয়ে অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নাকি সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন যে, অলীকবাবুর হেমাঙ্গিনী অর্থাৎ কাদম্বরীকেই তিনি এই সম্বোধন করেছিলেন। ইন্দিরা দেবী অবশ্য মনে করেন যে, কাদম্বরীর ডাকনাম 'হেকেটি' থেকেই এই শ্রীমতী হে। আবার শ্রী সমীর সেনগুপ্তের লেখায় পাই নতুন বৌঠানকে খ্যাপাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে 'হেকেটি' নামটি দেন।

আগেই বলেছি অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি ছিল কাদম্বরীর। তিনি নিজে লিখতেন না ঠিকই কিন্তু উপভোগ করতেন এবং সেইসঙ্গে খুব সুন্দর করে সাহিত্যের সমালোচনা করতে পারতেন। *ভারতী* পত্রিকার জন্যেও তাঁর চিন্তাভাবনা কিছু কম ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাজ দেখাশোনা করতেন, রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। আর কাদম্বরী সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কাজ করবার আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। ছাদের নন্দনকাননের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। শরৎকুমারীর ভাষায় তিনি ছিলেন 'ফুলের তোড়ার বাঁধন'।

ছাদের সান্ধ্যআসরে মাঝে মাঝেই এসে উপস্থিত হতেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁর লেখার খুব ভক্ত ছিলেন কাদম্বরী। কখনো কখনো কবিকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেনও তিনি। একবার একটা কার্পেটের আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন কবিকে। তার ওপরে কবির *সারদামঙ্গল* কাব্যের কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। এর উত্তরে কবি আরো একটি কাব্য রচনা করেন, যাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন *সাধের আসন* কিন্তু কাদম্বরী তখন আর ইহলোকে নেই।

ছাদের সান্ধ্যআসরে মাঝে মাঝেই এসে উপস্থিত হতেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁর লেখার খুব ভক্ত ছিলেন কাদম্বরী। কখনো কখনো কবিকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেনও তিনি। একবার একটা কার্পেটের আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন কবিকে। তার ওপরে কবির সারদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। এর উত্তরে কবি আরো একটি কাব্য রচনা করেন, যাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন সাধের আসন কিন্তু কাদম্বরী তখন আর ইহলোকে নেই।

মহর্ষির ছোটছেলের বিয়েতে কিন্তু তেমন কিছুই ঘটা হয়নি। মা তো অনেক আগেই পরলোকগতা। পিতাও তখন হিমালয়বাসী। আর কবির প্রিয় দুই বৌঠানও যে বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন এমন কথাও শোনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তিনি নিজে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বিয়ে করতে যাবেন না। তাই ভবতারিণীকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এনেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎই ঘনিয়ে এল দুর্যোগের কালো মেঘ। আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন কাদম্বরী– আফিম খেয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন। এর আগেও একবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে অনেক সংশয় লোকের মনে দেখা দিলেও আসল কারণ আজও অজানাই থেকে গেছে। পরিবারের উচ্চ মর্যাদা রক্ষায় সম্ভবত মহর্ষিদেব টাকা দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখ বন্ধ করেছিলেন। প্রতিভাময়ী, সুরুচিসম্পন্ন এই মহিলা নিজের হাতে নিভিয়ে দিলেন তাঁর জীবনদীপ। বড় বেশি অভিমানিনী ছিলেন নিঃসন্তান এই মহিলা। তবে মনে হয় এই নিঃসন্তান স্ত্রীকে যতটা সময় দেওয়া দরকার ছিল ততটা দিতে পারেননি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ বছর হলেও তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'তাঁকে ভালবাসি।'

এই ঘটনার ঊনত্রিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লেখেন, 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথকাদ ম্বরীর সম্পর্ক নিয়ে অনেক বাগবিস্তার হয়েছে। কিন্তু কাদম্বরী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের মধ্যে কোন গোপনীয়তা তাঁর মৃত্যুর আগেও ছিল না, পরেও নয়। কবি বরাবরই তাঁদের দু'জনের সম্পর্কের মাধুর্যের কথা স্বীকার করে গেছেন।

কাদম্বরীর মৃত্যুর কয়েকমাস আগেই বধূ হয়ে এ বাড়িতে পা রাখলেন আরেক কন্যা। নাম তার ভবতারিণী।

১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (ইংরেজি ১৮৮৩, ৯ ডিসেম্বর) ছোট্টমেয়ে ভবতারিণী দুরুদুরু বক্ষে প্রবেশ করলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। যেদিন তিনি এই বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন কি সেই সরল গ্রাম্য বালিকা জানতে বা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেমন হিমালয়সদৃশ বিশাল মাপের পুরুষকে তিনি স্বামীরূপে পেলেন? কত জন্মের তপস্যার ফলে এমন দেবদত্ত রূপবান ও গুণবান স্বামীর স্ত্রী হতে পারলেন?

খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির গোমস্তা। যশোর জেলায় অনেক পিরালী ব্রাহ্মণের বাস ছিল সেই সময়। তাদের মেয়েদের রূপের খ্যাতিও ছিল প্রচুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়েই বোধহয় সেখানে অভাব ঘটেছিল সুন্দরী মেয়ের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর দুই পুত্রকন্যা রবির জন্য মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন যশোরে। কিন্তু কোন মেয়েকেই শেষপর্যন্ত পছন্দ না হওয়ায় এই দশ বছরের ভবতারিণীই নির্বাচিত হলেন বধূ হিসেবে। রবির বয়স তখন তেইশ।

কোন রাজকন্যা বা জমিদারকন্যা নয় 'বাবু রবীন্দ্রনাথে'র বিয়ে হল বাংলাদেশের শ্যামলসবুজগ ন্ধমাখা এক গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে। নববধূকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিলেন কবি। নিজের বিয়ের এক অভিনব সুন্দর চিঠি তিনি বন্ধুদের লিখলেন নিজের হাতে। কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখলেন–

প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভ দিনে শুভ লগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি–

অনুগত–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষির ছোটছেলের বিয়েতে কিন্তু তেমন কিছুই ঘটা হয়নি। মা তো অনেক আগেই পরলোকগতা। পিতাও তখন হিমালয়বাসী। আর কবির প্রিয় দুই বৌঠানও যে বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন এমন কথাও শোনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তিনি নিজে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বিয়ে করতে যাবেন না। তাই ভবতারিণীকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এনেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হেমলতা ঠাকুরের লেখা থেকে জানা যায়, 'নিজের বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ এলেন অন্দরমহলে।' জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মোৎসব দালানে কুলপ্রথানুসারে বিয়ে হয়েছিল কবির। তবে নিজের বিয়েতে যে খুব একটা সমারোহ হয়নি– এ নিয়ে কবির মনে বরাবরই ক্ষোভ ছিল।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নববধূ ভবতারিণীকে আশীর্বাদ করে বললেন 'স্বর্ণ মৃণালিনী হও'। সেই থেকে নাম হল মৃণালিনী। অনেকে আবার বলেন স্ত্রীর এই মৃণালিনী নাম রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দেওয়া। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূটিকে লরেটো স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ঊর্মিলা দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মৃণালিনী যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মান্য করে গেছেন বাবামশাইকে, মহর্ষিদেবও তেমনি স্নেহ করতেন তাঁকে।

লরেটো স্কুলে এক বছর পড়াশুনো করেন মৃণালিনী। এছাড়া হেমেন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু বিষয়ে পারদর্শিনী স্ত্রী নৃপময়ীর কাছেও আরম্ভ হয় তাঁর শিক্ষা। কবি নিজেও স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। প্রায় সমবয়সী ভাশুরপো, ভাশুরঝিদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ও আদরের কাকীমা ছিলেন মৃণালিনী। ইন্দিরা দেবী কবিপত্নী সম্বন্ধে লিখেছেন, 'রূপে না হলেও গুণে তিনি পরবর্তীজীবনে শ্বশুরবাড়ির সকলকে আপন করতে পেরেছিলেন, এ কথা সকলে জানেন।' বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ নিজে যা কিছু বাংলা, ইংরেজি অথবা সংস্কৃত পাঠ করতেন তা প্রিয় কাকীমাকে পড়ে শোনাতেন ও সহজসরল ভাষায় তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও *রামায়ণ* প্রভৃতি সংস্কৃত শেস্নাকের অর্থগ্রহণ যাতে সহজ হয় তাই পত্নীকে মোটামুটিভাবে সংস্কৃত শেখাবার উদ্যোগ নেন ও আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। কবির উৎসাহে পরে তিনি *মহাভারত, মনুসংহিতা, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ* প্রভৃতির অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেন। এগুলি এখনো শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সম্পূর্ণ *রামায়ণ* পড়ে সেটিরও বাংলা তর্জমা করেন মৃণালিনী। যদিও মৃত্যুর আগে সেটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাছাড়াও কবি স্ত্রীকে দিয়ে অনেক রূপকথার গল্প সংগ্রহ করিয়েছিলেন। এগুলি মৃণালিনী একটি বাঁধানো খাতায় টুকে রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রন্ধনপটিয়সী কবিপত্নীর রান্নার খাতা, তাঁর

লেখা চিঠিপত্র, তাঁর রামায়ণের অনুবাদ ও রূপকথার গল্পের সংগ্রহের খাতা– সব হারিয়ে গেছে। মৃণালিনীর এই *রূপকথার গল্পসংগ্রহ* থেকে কবির *সোনার তরী* কাব্যের 'রাজার ছেলে', 'রাজার মেয়ে', 'বিম্ববতী' প্রভৃতি গল্পের আভাস পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর *ক্ষীরের পুতুল* এই সংগ্রহ থেকেই পেয়েছিলেন।

ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা এ সবের সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনী ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য বধূদের মত পারিবারিক অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর বির্জিতলার বাড়িতে *রাজা ও রানী* নাটকের অভিনয় হয়। তাতে নারায়ণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। আর তার সঙ্গে তাঁর স্বামী দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁর ভাশুর সত্যেন্দ্রনাথ। জীবনে প্রথমবার অভিনয় করলেও তাঁর অভিনয় সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিল। যদিও নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পরে সম্পর্কের বিচারে নাটকে এই সব ভূমিকায় অংশগ্রহণ তৎকালীন সমাজে সমালোচনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপও কম হয়নি।

সর্বকনিষ্ঠা বধূ এবং রূপে ও পাণ্ডিত্যে অন্যদের মত দক্ষ না হলেও মৃণালিনীই ছিলেন প্রকৃত অর্থে ঠাকুরবাড়ির গৃহিণী। বাড়ির যে কোন উৎসবঅনুষ্ঠানে তিনি অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত বাড়িতে দিতেন। ভাশুরপুত্রদের মধ্যে অনেকেই তাই ছোটকাকাকাকীমার কাছে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। সাজগোজ করতে একদম পছন্দ না করলেও অসাধারণ রন্ধনপটিয়সী ছিলেন তিনি। বাড়িতে নিজের হাতে নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি করতেন আর তাও প্রচুর পরিমাণে। মানকচু দিয়ে মুড়কি ও মালপো রচনায় মৃণালিনীর ছিল বিশেষ দক্ষতা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়– 'তাঁর হাতের চিঁড়ের পুলি দইএর মাল পো আর পাকা আমের মিঠাই যিনি একবার খেয়েছেন তার স্বাদ তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেননি।' এ ব্যাপারে কবির উৎসাহও ছিল প্রচুর। তিনিও মাঝে মাঝে রান্নার জায়গায় একটা টুল পেতে বসে নানান রকম নতুন নতুন রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত্ম হাল ধরতে হত মৃণালিনীকেই। অবশ্য কবির হাতেও তা মাঝে মধ্যেই সুন্দর উৎরিয়ে যেত আর কবি ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

শুধুমাত্র বাড়ির লোকজনের কাছেই নয় সহৃদয়তার জন্য মৃণালিনী তাঁদের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের কাছেও খুব প্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহ থেকে চলে আসেন তখন সর্বস্তরের কর্মচারীই তাঁদের দুঃখে চোখের জল ফেলেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন, 'দিদির বিয়ে অল্প অল্প মনে পড়ে। বাড়িতে অনেকের যাওয়া আসা ও হাসিগল্প। আত্মীয়স্বজন সকলে খুব খুশী। প্রথম কাজ মায়ের। শ্বশুরবাড়ির সবাই মাকে খুব ভালবাসতেন, কাজেই তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আনন্দ তো হবেই।'

১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সহধর্মিণী মৃণালিনী এবারে হয়ে উঠলেন কবির প্রকৃত সহমর্মিনী। আশ্রমের প্রয়োজনে নিজের গায়ের সমস্ত গহনা স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক এক করে। আশ্রমের সমস্ত ছোট ছোট ছেলেদের তিনি ছিলেন মাতৃস্বরূপা। নানান রকম ঘরে তৈরি মিষ্টান্নে তাঁর ভাঁড়ার পূর্ণ থাকত সর্বদা। রথীন্দ্রনাথের *পিতৃস্মৃতি* থেকে জানা যায় যে তিনি মাঝে মাঝেই আশ্রমের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হানা দিতেন মায়ের ভাঁড়ারে। কবিও অনেক সময়েই কোন বন্ধু-বান্ধবকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে বলতে ভুলে গেলে কবিপত্নী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা সামলে নিতেন।

কবির ওপরে মৃণালিনীর প্রভাবও ছিল অত্যন্ত বেশি। অভিমানিনী কবিপ্রিয়া কোন কারণে অভিমান করে থাকলে কবিকে অনেক সাধ্য-সাধনা ক রে তাঁর মান ভাঙাতে হত। কবি বেশ ভয়ও করতেন তাঁকে।

অবশেষে নতুন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করে ভেঙে পড়ল মৃণালিনীর শরীর। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হল তাঁকে। তিন মাস রোগভোগের পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার ১১ মাস পরে ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ সমস্ত সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন মৃণালিনী। এই তিন মাস রাতদিন জেগে কবি সেবা করেছেন স্ত্রীর, পাছে অন্য কারো হাতে স্ত্রীর কোন অযত্ন হয়।

ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে দুটি পরিবারের শিক্ষা, রুচি, বৈভব, অভিজাত্যের দিক থেকে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই এগারো বছরের বালিকাবধূটি শ্বশুরবাড়িতে তাঁর অন্তরঙ্গ, সহজাত বুদ্ধিতে কেমন সুন্দর নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই হিমালয়-সদৃশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীও সংসারের কোন ক্ষেত্রেই তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াননি। অনেকাংশেই কবিপত্নী তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজেকে। তাঁর অপরিসীম মমতাময় ভালবাসায়, তাঁর সেবায়, তাঁর সংসারধর্মের পারিপাট্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। আর মনে হয় দাম্পত্যজীবনে বেশ সুখীই হয়েছিলেন কবি।

কলকাতার কাছে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন কবি। পরিবারের লোকজদের কাছে অনেক ভর্ৎসনা, অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে স্বামীর এই বিশাল কর্মকা- সহৃদয়তার সঙ্গে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মৃণালিনী। স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে কবি মংপুতে এসে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন, 'আধুনিক ভাবে আমাদের বিয়ে হয় নি তো তাতে কিছুই এসে যায় নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ করে ইদানীং অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একান্ত আগ্রহ হয়েছিল আমার কাজ করবার। কিন্তু সে তো হল না– অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল।' তাঁর মৃত্যুর পরে *স্মরণ* কাব্যে কবি লেখেন–

'আপনার অধিকারে নীরবে নির্মম করে
রেখেছিলে সংসারে সবার পশ্চাতে হেলাভরে'।

তবে শুধুমাত্র *স্মরণ* কাব্যগ্রন্থই নয় কবির অসংখ্য কবিতায়, অজস্র চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে তাঁর আদরের 'ছোট বউ' বা 'ছুটি'র স্মৃতি।

একুশ বছরের রবীন্দ্রনাথ বিবাহ করেছিলেন এগারো বছরের ভবতারিণীকে কিন্তু গভীর মমতায়, স্নেহে, ভালবাসায়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন তাঁর আদরের 'ছোট বউ'কে। বালিকাবধূর পুতুল খেলাকেও সস্নেহে প্রশ্রয় দিতেন কবি।

বিয়ের চার বছর পরে কবি সপরিবারে গাজীপুরে বেড়াতে গেছেন। তখনই লিখেছিলেন *মানসী* কাব্যের তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি। এ বিষয়ে শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'কবির এখন প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। সকন্যা কবিজায়াকে নিয়ে তিনি গাজীপুরের নিভৃত কবিকুঞ্জে জীবনের মাধুর্যলীলার পূর্ণ আস্বাদনের সুযোগ পান। কবির দাম্পত্যজীবনে এই গাজীপুরপর্বটি বিশেষ উলেখযোগ্য। এতদিন কলকাতায় বৃহৎ পরিবারের দশজনের মধ্যে তাঁদের দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে।

গাজীপুরেই তাঁরা প্রথম প্রকৃতির পরম নির্জনতায় উভয়ের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেলেন। স্বভাবতই গাজীপুরে একাধিক কবিতায় নিবিড়তম দাম্পত্যমিলনের আলেখ্য বিরচিত হয়েছে। *মানসী* কাব্যের এই পর্যায়ের কবিতায় কবি লেখেন–

'দুদিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুল গতি ব্যগ্র প্রাণে
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথ পারাবারে
থামিয়া গেল অধীর স্রোতে
থামিল কলতান
মৌন এক মিলন রাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি
প্রলয় তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান ॥

মহর্ষিদেবের সব পুত্রবধূই এসেছেন তাঁদের তুলনায় ধনেমা নে ও সামাজিক মর্যাদায় অনেক নিম্নস্থ পরিবার থেকে। কিন্তু নিজেদের গুণে, বুদ্ধিতে ঠাকুরপরিবারের বউরা ঘরেবাইরে সম্মানের সঙ্গে উচ্চ মর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মিলি চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রাবন্ধিক

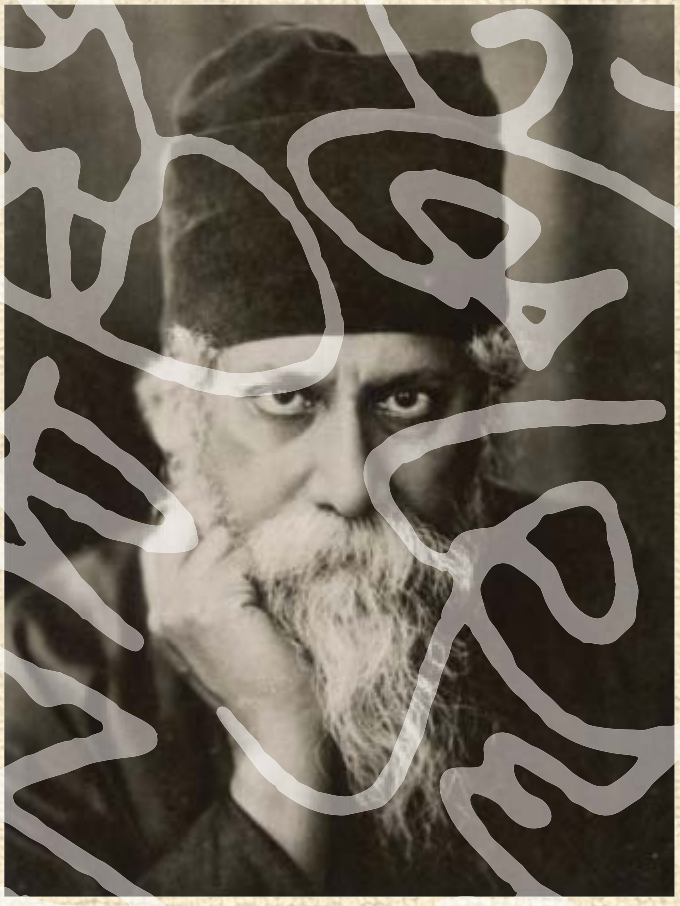

বিচিত্রিতা

আমাদের বটতল আমাদের পড়াপুট

রণজিৎ বিশ্বাস

বারবার তিনি আমাদের ধাঁধায় ফেলেন। বারবার তিনি আমাদের প্রশ্নের মুখে ফেলেন– আমি তোমাদের কী হই? এবং কী আমি তোমাদের নই?!

চমকলাগা মানুষের মত আমরা ভাবতে বসি– কী যে তিনি আমার নন! কী নয় যে তিনি আমাদের হন!

তাঁর গানের বাণী গাইতে গাইতে দেহে অবসাদ নামে না, মনে নামে না ক্লান্তি। তারপরও বিস্ময়ে ব্যাকুল মন জানতে চায়– এ গাওয়ার কি কোন শেষ আছে? আছে কি এর ওড়পার! মনেরই আরেক কোণ জবাব উজিয়ে দেয়– না। শেষ নেই। এ গাওয়ার শেষ নেই, শেষ নেই এ পথ চলারও। এ পথ নিরূপিত দৈর্ঘ্যের কোন মার্গ নয়, অনিঃশেষ এক ভ্রমণরেখা। ভিন ভাষার শব্দে বললে– a never ending trail.

ভ্রমণের এই রেখা ধরে এগুতে এগুতে মনে হয়– বিপদ আসুক, বাধা আসুক, স্বস্তি হারাক, স্বপ্ন ছুটুক একটি বটতল একটি আশ্রয়চাতাল একটি নন্দকুলায় একটি শান্তিনীড় ও বরাভয়বিস্তারী একটি পক্ষপুটতো আমাদের আছেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভুবনের সর্বসেরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যে কোন বয়ঃক্রমেই একেবারে নিখর্চায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়া যায়। প্রয়োজন শুধু আগ্রহ আর অন্তরনিলয়ের মুক্ত বাতায়ন। অনুভবসূত্রগুলো যদি ধরে ধরে বলি–

আজ সুপেয় জলের মহাসমুদ্রের ঘটি দু'ঘটি জল নিয়ে, চয়িত কয়েকটি বিন্দু নিয়ে ক্ষুদ্র এই মরণশীল দুঃসাহসের কাজটি মাথায় নিয়ে আপনাদের ক্ষমার মাঝে থাকতে চায়।

মনে যখন অহম নামে শব্দেসুরে যারা গাইতে জানে না তারাও মনে মনে গাইতে শুরু করে–

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে / সকল অহঙ্কার হে
আমার ডুবাও চোখের জলে...'

ছিল এটি *গীতাঞ্জলির* প্রথম ভুক্তি। *গীতিবিতান*-এর স্বদেশ-পর্বের প্রথম ভুক্তি আমাদের, বাংলাদেশের ভূগোলে বসবাসকারী প্রায় সতেরো কোটি মানুষের সবচেয়ে প্রিয় গান। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এই পর্বের চতুর্দশ ভুক্তি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত তাঁর হাতে রচিত না হলেও যাঁর রচনা তিনি শান্তিনিকেতনেরই শিক্ষার্থী।

স্বদেশ পর্বের, হয় পুরোটা নয় খানিকটা কোন শিল্পী যখন গান উজাড় কণ্ঠে, কেন তখন গাই না মনে মনে–

এক.
'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥'

দুই.
'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।'

তিন.
'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।'

চার.
'বাংলা মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥'

স্বদেশ-পর্বের আর দুটি গান শুধু আর দুটি গান আমরা শোনাতে চাই আমাদের ভাবনার দীপশিখাকে পিলসুজের ওপর তুলে ধরার জন্য, যেন তার আলোয় চিনে নিতে পারি শতবর্ষ পার হওয়ার পরও জ্ঞানচক্রবর্তীকুলে এই বৃহস্পতিজনার ভাবনচিন্তন কত প্রাসঙ্গিক। প্রথমে, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'

ও পরে– আমাদের যাত্রা হলো শুরম্ন এখন,/ ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার

গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজার মত তাঁর শব্দ ও তাঁর বাক্যে ভাবের প্রকাশ করি, শুভ কর্মপথে যখন আমরা একা হয়ে যাই, যখন কেউ পাশে দাঁড়াবার সাহস করে না, যখন ভয়ে সবাই দুয়ার দেয় তখন বড় প্রাসঙ্গিক মনে হয়–

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলোরে
যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়–
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তুই মনের কথা একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়–
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে–
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

অথবা, আমাদের তখন আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে সেইসব পঙ্‌ক্তিনিচয়ে–

'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না ॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে–
ও বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না ॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী–
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বন্ধদুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে–
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥
প্রতিকূল সময়ে আমরা গাইতে চেয়েছি–
'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে ভাসা তরী
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
গাইতে আমরা বারবার চাই–
নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে ॥
অথবা, দেশপ্রেমের প্রবল প্রণোদনায় গলায় তুলে নিতে পারতাম–
আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ॥
কিংবা
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ
মাগো, আমি তোমার চরণ, করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না।
আর কারও ধার ধারব না।

কিন্তু, সীমাবদ্ধ সময়ে আমরা যে আরও কিছু চরণে জীবনের মৃত্যুহীন বাণীতে নড়তে ও সরতে চাই। তার আগে যারা আমাদের দেশপ্রেমে ও মাতৃপ্রেমে উন্মাদনা খুঁজে কটাক্ষ করে, তাদের উদ্দেশ্যে গেয়ে যাই–

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু–
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু পিছু ॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক সে বসে গদির 'পরে–
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু ॥

রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও বড় আনন্দযন্ত্রণায় আর ছদ্মক্ষোভে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে– খেল কেন অমন খেলা তুমি সবার সনে! কী সেই খেলা। গাইছেন তিনি তাঁর মত করে গড়ে নেয়া, ভালবাসা ও বাহুতে বাঁধা ঈশ্বরের উদ্দেশে, কিন্তু তাঁর নিবেদন তাঁর বিবাদ তাঁর বিশিষ্ট ও অননুকরণীয় উচ্চারণ শ'প্রতিশত মিলে যাচ্ছে মানবিক প্রেমের উচ্চারণের সঙ্গে। যাকে ভালবাসি, কিন্তু যার ভালবাসার মূল্য দিইনি, তাকে তো আমি বলতেই পারি–

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি।'

অথবা–

নিজের প্রেমিকাকে তো আমি বলতেই পারি–
কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত!
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মত ॥

'হৃদিমন্দির দ্বারে বাজুক সুমঙ্গল শঙ্খ' বলতে বলতে যাকে মাথার খোপে প্রকোষ্ঠে যত্নে বসিয়ে রেখেছি, তার উদ্দেশেই তো আমি গাইব–

'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ॥'
আমার পরম প্রিয় মানবীকেই তো আমি বলব–
'তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥'
যার হৃৎকন্দরে আমার হৃদয় বন্ধক রাখতে চাই, তাকেই তো বলব আমি–
'আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা ॥
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ ভুবন ব্যাপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দু'টি আঁখিতারা ॥'
যার মণিবন্ধ মুঠোয় নেব বলে অনেক বিনিদ্ররাতের প্রহর পার করেছি তাকেই তো বলব আমি–
'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।'
বিপদে তিনি ঈশ্বরের নিঃশর্ত সহায়তা চান না বলেই নির্ভয়ে বলতে পারেন–
'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা–
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।
কোন প্রতীকী নয়, প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের সঙ্গে মধুর কোন খেলার ছলে নয়, মানবিক প্রেম প্রকাশের উচ্চারণ কেমন শৈল্পিক ও নান্দনিক হতে পারে, অনুভবের জন্য স্মরণ করি–
'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।'
রক্তমাংসঅস্থিমজ্জার দু'টি অস্তিত্বের হৃদয়ের কথার চূড়ান্ত উচ্চারণ এর চেয়ে সুন্দর আর কেমন হতে পারে–
'ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো– তোমার
মনের মন্দিরে।
পথের শেষ নেই। তবু পরিবেশনার প্রান্তবিন্দুতে আমাদের পরিবেশনা প্রেমপর্বেরই একটি গান। প্রেমের সরণিতে চলতে চলতে আমি যখন পুরনো হব, যখন নতুন যুগের প্রেমিকা আমার দিকে তাকাবে বাঁকা চোখের সংশয়বিদ্ধ দৃষ্টিতে তখনই তো আমি গেয়ে উঠব–
'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে
অলস অন্য মনে।'
গানের শেষ কথা ছিল–
মোর দানে নেই দীনতা লেশ
যত নেবে তুমি না পাবে শেষ
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে।
পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে...
যাঁর দানের শেষ নেই, তিনি বলতেন– যে মরিতে জানে সেই জয় করিতে জানে। যে জয় করিতে জানে ভোগের ও সুখের অধিকার তাহারই। তিনিই আবার বলেছেন– মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই/ এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে/ জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
দু'টি পথই ভ্রমণদুরূহ। রবি আর নেই, আমরা যারা এখনও আছি তাঁর নামে উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কিংবা দ্বারেদুয়ারে তারা যেন তাঁর দেয়া দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য তাঁরই *কণিকার* এক কণা স্মরণ করি–
'কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগত রহে নিরুত্তর ছবি
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'
এই আহ্বানের মাধ্যমে কথায় যতি বসুক– সত্য সুন্দর সাধুতা সুরুচি দেশপ্রেম ও মানবতার পথে আমরা যেন একেকটি মাটির প্রদীপ হয়ে যেতে পারি। যথার্থই মাটির প্রদীপ।

রণজিৎ বিশ্বাস সিনিয়র সচিব, রম্যলেখক, কথাকার

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে *ভারত বিচিত্রার* অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। *ভারত বিচিত্রার* পুরনো ও নতুন গ্রাহক-পাঠকদের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উলেস্নখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

ভারত বিচিত্রার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

উৎসব

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল বাঙালির প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। শারদীয়া দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্ত্মী দুর্গাপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালসহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে দুর্গাপূজা পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ভারতের অসম ও ওড়িশা রাজ্যে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুসমাজেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথামাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে থাকেন। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরাও দুর্গাপূজা করে থাকেন। ২০০৬ সালে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে *ভয়েসেস অফ বেঙ্গল মরসুম* নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি অভিবাসী ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষটিকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন হিন্দুরা তর্পণ করে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরে দুর্গাপূজা পালিত হয়। সেক্ষেত্রে মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে পূজা শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির এবং অনেক পরিবারে এই রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মহাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মহাসপ্তমী থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত) চার দিন সরকারি ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমী সরকারি ছুটির দিন।

পারিবারিক স্তরে দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলিতেই আয়োজিত হয়। কলকাতা শহরের পুরনো ধনী পরিবারগুলির দুর্গাপূজা বনেদি বাড়ির পূজা নামে পরিচিত। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলিতে শাস্ত্রাচার পালনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষ্যে বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এখন সর্বজনীন পূজায় থিম বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। থিমগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে *শারদ সম্মান* নামে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এছাড়া বেলুড় মঠসহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

অকালবোধন

শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলা হয়। *কালিকা পুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাপূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে এই পূজার নাম অকালবোধন। এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবী কিভাবে দুর্গাপুজা করেছিলেন তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। বলা হয়েছে:

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেণ পরমাত্মানা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাগমণ্ডলে।
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা ॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা। চ
তুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী ॥
তদা মুনীন্দ্রেঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা ॥

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছেন।

দেবীভাগবত পুরাণ

শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ *দেবীভাগবত পুরাণ* অনুসারে, ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসক হয়ে ক্ষীরোদসাগরের তীরে দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। এই সময় তিনি 'বাগভব' বীজ জপ করতেন এবং আহার ও শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একশো বছর ধরে ঘোর তপস্যা করেন। এর ফলে তিনি শীর্ণ হয়ে পড়লেও কাম ও ক্রোধ জয় করতে সক্ষম হন এবং দুর্গানাম চিন্তা করতে করতে সমাধির প্রভাবে স্থাবরে পরিণত হন। তখন দুর্গা প্রীত হয়ে তাঁকে বর দিতে আসেন। মনু তখন দেবতাদেরও দুর্লভ একটি বর চাইলেন। দুর্গা সেই প্রার্থনা রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে দুর্গা তাঁর রাজ্যশাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেন এবং তাঁকে পুত্রলাভের বরও দেন।

দেবীমাহাত্ম্য

দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যতগুলি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিটি পাওয়া যায় *শ্রীশ্রীচণ্ডী* বা *দেবীমাহাত্ম্যমে*। এই কাহিনিটি হিন্দুরা এতটাই মান্য করেন যে *শ্রীশ্রীচণ্ডী* পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। দেবীমাহাত্ম্য আসলে *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশো শ্লোক আছে। এই বইয়ে দুর্গাকে নিয়ে প্রচলিত তিনটি কাহিনি ও দুর্গাপূজা প্রচলনের একটি কাহিনি রয়েছে। প্রতিটি কাহিনিতে দুর্গাই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

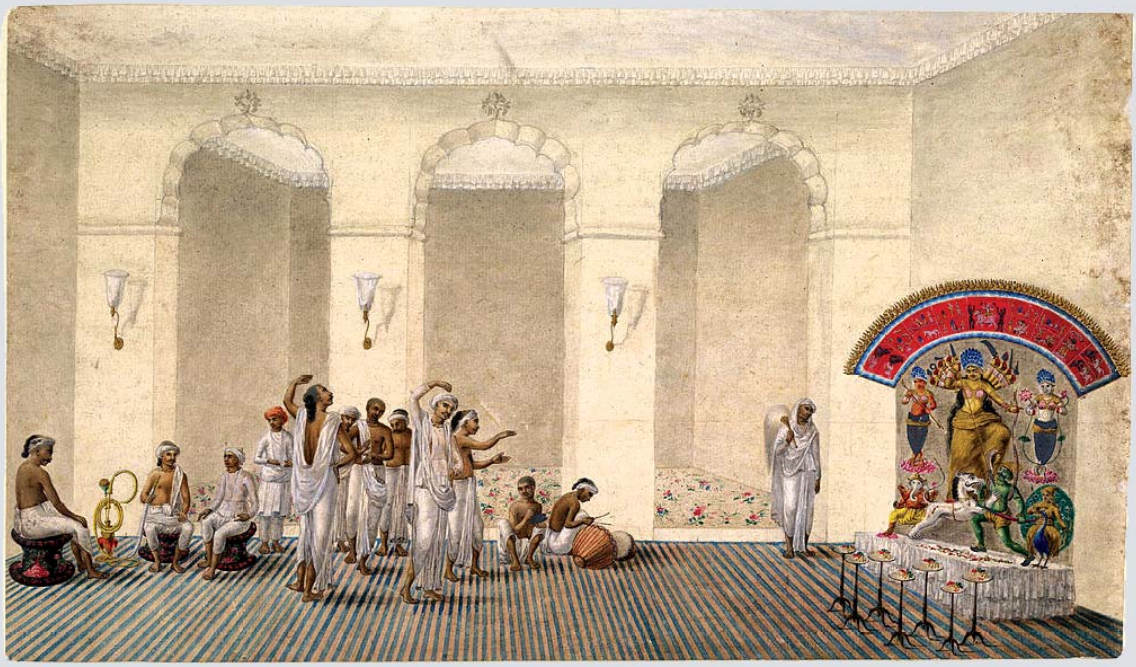

রাজা সুরথের কাহিনি

রাজা সুরথের কাহিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রধান তিনটি অবতরণিকা ও যোগসূত্র। সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা। সুশাসক ও যোদ্ধা হিসেবে তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল কিন্তু একবার এক যবন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে। সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা তাঁর ধনসম্পদ ও সেনাবাহিনির দখল নেন। সুরথ মনের দুঃখে বনে চলে আসেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধা নামে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মেধা রাজাকে সমাদর করে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন কিন্তু বনে থেকেও রাজার মনে সুখ ছিল না। সবসময় তিনি তাঁর হারানো রাজ্যের ভালমন্দের কথা ভেবে শঙ্কিত হতেন। এমন সময় একদিন তিনি বনের মধ্যে সুরথ সমাধি নামে এক বৈশ্যের দেখা পেলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সুরথ জানতে পারলেন, স্ত্রী ও ছেলেরা তাঁর টাকাপয়সা ও বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু তাও তিনি সব সময় নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের কল্যাণঅকল্যাণের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল, যারা তাঁদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, তাদের প্রতি তাঁদের রাগ হচ্ছে না কেন? কেনই বা তাঁরা সেই সব লোকের ভালমন্দের কথা চিন্তা করে করে শঙ্কিত হচ্ছেন? দু'জনে মেধা ঋষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ঋষি বললেন, পরমেশ্বরী মহামায়ার প্রভাবেই এমনটি হচ্ছে। সুরথ তাঁকে মহামায়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি একে একে তাঁকে তিনটি গল্প বলেন। এই গল্পগুলিই *শ্রীশ্রীচণ্ডী*র মূল আলোচ্য বিষয়। বইয়ের শেষে দেখা যায়, মেধার গল্প শুনে সুরথ ও সমাধি নদীর তীরে তিন বছর কঠিন তপস্যা ও দুর্গাপূজা করলেন এবং শেষে দুর্গা আবির্ভূতা হয়ে সুরথকে হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং সমাধি বৈশ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন।

মধুকৈটভের কাহিনি

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে মধুকৈটভের উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণসমু দ্রে পরিণত হলে বিষ্ণু সেই সমুদ্রের উপর অনন্তনাগকে শয্যা করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হলেন। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য নির্গত হয়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল। ভীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগরিত করলে তিনি পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু ও কৈটভের সঙ্গে মহাসংগ্রামে রত হলেন। মহামায়া শেষে ঐ দুই অসুরকে বিমোহিত করলে তারা বিষ্ণুকে বলে বসে, 'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা প্রীত, তাই আপনার হাতে মৃত্যু আমাদের জন্য শ্লাঘার বিষয়। পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিত নয়, সেখানে আপনি আমাদের উভয়কে বিনাশ করতে পারেন।' বিষ্ণু বললেন, 'তথাস্তু।' তারপর অসুরদ্বয়ের মাথা নিজের জঙ্ঘার উপর রেখে তিনি তাদের বধ করলেন।

মহিষাসুরের কাহিনি

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গার কাহিনিগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রন্থের মধ্যম চরিত্র বা দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত মহিষাসুর বধের কাহিনিটি। এই কাহিনি অনুসারে পুরাকালে মহিষাসুর দেবগণকে একশতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিলে বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। প্রথমে বিষ্ণু ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হল। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হল। স্নুউ চ্চ হিমালয়ে স্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হলেন। অন্য সূত্র থেকে জানা যায়, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে দেবী কাত্যায়নী আবির্ভূতা হয়েছিলেন; শুক্লা সপ্তমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেন এবং দশমীতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন। যাইহোক, এক এক দেবের প্রভাবে দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হল। প্রত্যেক দেবতা তাঁদের আয়ুধ বা অস্ত্র দেবীকে দান করলেন। হিমালয় দেবীকে তাঁর বাহন সিংহ দান করলেন। এই দেবীই অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী রূপে মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন (*শ্রীশ্রীচণ্ডী* অনুসারে, দেবী মহালক্ষ্মী মহিষাসুর বধ করেন। ইনিই দুর্গা। তবে বাঙালিরা এঁকে দশভূজারূপে পূজা করে থাকেন)। দেবী ও তাঁর বাহনের সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হতে লাগল।

মহিষাসুর সেই প্রকম্পনে ভীত হয়ে প্রথমে তাঁর সেনাদলের বীরযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করল। দেবী ও তাঁর বাহন সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে একে একে সকল যোদ্ধা ও অসুরসেনাকে বিনষ্ট করলেন। তখন মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রত হল। যুদ্ধকালে ঐন্দ্রজালিক মহিষাসুর নানা রূপ ধারণ করে দেবীকে ভীত বা বিমোহিত করার চেষ্টা করল কিন্তু দেবী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন অসুর অহংকারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করল। দেবী বললেন, 'রে মূঢ় যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। আমি তোকে বধ করলেই দেবতারা এখানে শীঘ্রই গর্জন করবেন'। এই বলে দেবী লাফ দিয়ে মহিষাসুরের উপর চড়ে তাঁর কণ্ঠে পা দিয়ে শূলদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করে তাকে বধ করলেন। অসুরসেনারা হাহাকার করতে করতে পলায়ন করল এবং দেবতারা স্বর্গের অধিকার ফিরে পেয়ে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।

শুম্ভ নিশুম্ভের কাহিনি

দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবী দুর্গা সংক্রান্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনিটি হল শুম্ভনি শুম্ভ বধের কাহিনি। গ্রন্থের উত্তর চরিত্র বা তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরভ্রাতা স্বর্গ ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ অধিকার করে নিলে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীর স্তব শুরু করলেন (পঞ্চম অধ্যায়ে উলিস্নখিত এই স্তবটি অপরাজিতস্তব নামে পরিচিত; এটি হিন্দুদের অতিপবিত্র ও নিত্যপাঠ্য একটি স্তবমন্ত্র: 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' ও সমরূপ মন্ত্রগুলি এই স্তবের অন্তর্গত)। এমন সময় পার্বতী সেই স্থানে গঙ্গাস্নানে উপস্থিত হলে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে আদ্যাদেবী তাঁর দেহকোষ থেকে নির্গত হলেন। এই দেবী কৌশিকী নামে আখ্যাত হলেন ও শুম্ভনি শুম্ভ বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শুম্ভনি শুম্ভের চর চণ্ড ও মুণ্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজ প্রভুদ্বয়কে বলল যে, এমন স্ত্রীলোক আপনাদেরই ভোগ্য হবার যোগ্য। চ৯মু ণ্ডের কথায় শুম্ভনি শুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে দেবীর কাছে পাঠাল। সুগ্রীব দেবীর কাছে শুম্ভনি শুম্ভের কুপ্রস্তাব ব্যক্ত করল। দেবী মৃদু হেসে বিনীত স্বরে বললেন, 'তুমি যথার্থই বলেছ। এই বিশ্বে শুম্ভনি শুম্ভের মত বীর কে আছে? তবে আমি পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাকে যে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে কেবলমাত্র তাকেই আমি বিবাহ করব। এখন আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি কি করে? তুমি বরং মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বল, তাঁরা যেন এখানে এসে আমাকে পরাস্থ করে শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করেন। আর বিলম্বে কি প্রয়োজন?' সুগ্রীব ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিল কিন্তু দেবী নিজবাক্যে স্থির থেকে তাকে শুম্ভনি শুম্ভের কাছে প্রেরণ করলেন।

দেবীর কথায় কুপিত হয়ে অসুররাজ শুম্ভ তাঁকে উচিত শিক্ষা দিতে দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করল। ধূম্রলোচনের সঙ্গে দেবীর ভয়ানক যুদ্ধ হল ও সেই যুদ্ধে ধূম্রলোচন পরাজিত ও নিহত হল। এই সংবাদ পেয়ে শুম্ভ চ৯মু ণ্ড ও অন্যান্য অসুরসৈন্যকে প্রেরণ করল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবী নিজ দেহ থেকে দেবী কালীর সৃষ্টি করলেন। দেবী কালী ভীষণ যুদ্ধের পর চ৯মু ণ্ডকে বধ করলেন। দেবী দুর্গা তাঁকে চামুণ্ডা আখ্যায় ভূষিত করলেন।

চ৯মু ণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শুম্ভ সকল দৈত্যসেনাকে সুসজ্জিত করে প্রেরণ করল দেবীর বিরুদ্ধে। তখন দেবীকে সহায়তা করতে প্রত্যেক দেবতা শক্তিরূপ ধারণ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। এই দেবীরা হলেন– ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী প্রমুখ। এঁরা প্রচণ্ড যুদ্ধে দৈত্যসেনাদের পরাভূত ও নিহত করতে লাগলেন। এই সময় রক্তবীজ দৈত্য সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হল। তার রক্ত একফোঁটা মাটিতে পড়লে তা থেকে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ দৈত্য সৃষ্টি হয়। এই কারণে দুর্গা কালীর সহায়তায় রক্তবীজকে বধ করলেন। কালী রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়তে না দিয়ে নিজে পান করে নেন।

এরপর শুম্ভ আপন ভ্রাতা নিশুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করল। প্রচ- যুদ্ধের পর দেবী দুর্গা নিশুম্ভকে বধ করলেন। প্রাণপ্রতিম ভাইয়ের মৃত্যুশোকে আকুল হয়ে শুম্ভ দেবীকে বলল, 'তুমি গর্ব কোরো না, কারণ তুমি অন্যের সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছ।' দেবী বললেন, 'একা আমিই এ জগতে বিরাজিত। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই বিভূতি। দ্যাখ, এরা আমার দেহে বিলীন হচ্ছে।' তখন অন্যান্য সকল দেবী দুর্গার দেহে বিলীন হলেন। দেবীর সঙ্গে শুম্ভের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধান্তে দেবী শুম্ভকে শূলে গ্রথিত করে বধ করলেন। দেবতারা পুনরায় স্বর্গের অধিকার ফিরে পেলেন।

বাল্মীকির রামায়ণ

বাল্মীকির রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কোন বিবরণ নেই কিন্তু রামায়ণের পদ্যানুবাদ করার সময় কৃত্তিবাস ওঝা *কালিকাপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্মপুরাণের* কাহিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সংযোজিত করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে, রাবণ ছিলেন শিব ভক্ত। শিব তাঁকে রক্ষা করতেন। তাই ব্রহ্মা রামকে পরামর্শ দেন, শিবের স্ত্রী দুর্গার পূজা করে তাঁকে তুষ্ট করতে। তাতে রাবণবধ রামের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে দুর্গার বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন রাম কল্পারম্ভ করেন। তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন। হনুমান তাঁকে ১০৮টি পদ্ম জোগাড় করে দেন। দুর্গা রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম না পেয়ে রাম পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে দুর্গা আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন।

মূর্তিতত্ত্ব

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনি ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর ডানপাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিকেয়। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গার প্রচলন করেন। তাঁরা কার্তিকেয়র রূপ দেন জমিদারপুত্রের, ইতোপূর্বে যা ছিল সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের আদলে যুদ্ধের দেবতারূপে। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডানপাশে উপরে গণেশ ও নিচে লক্ষ্মী; বামে উপরে কার্তিকেয় ও নিচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দীভৃঙ্গীসহ

বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কলকাতায় কোনও কোনও বাড়িতে দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকেয়র সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতে দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তি চোখে পড়ে। তবে দুর্গার রূপকল্পনা বা কাঠামোবিন্যাসে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, বাংলায় দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিতা হন। এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রমেয়ানন্দের উক্তিটি স্মরণীয়: 'ধনদাত্রী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য বীর্যের প্রতীক কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তাঁদের বাহন– সকলের মূর্তিসহ মহামহিমময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা ও পূজা বাংলার নিজস্ব।'

দুর্গা

হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গা নামটির ব্যাখ্যা এরকম:

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত ॥

[দ অক্ষর দৈত্যনাশক, উ কার বিঘ্ননাশক, রেফ রোগনাশক, গ অক্ষার পাপনাশক এবং আ কার ভয় ও শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয় শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।] অন্যদিকে *শব্দকল্পদ্রুম* অনুসারে, দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা' –অর্থাৎ দুর্গা নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্যদুর্গা নামে অভিহিতা। আবার *শ্রীশ্রীচণ্ডী* অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

দুর্গার বাহন সিংহ। *শ্রীশ্রীচণ্ডীতে* সিংহকে 'মহাসিংহ', 'বাহনকেশরী', 'ধৃতসট' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। দুর্গাপূজার সময় সিংহকেও বিশেষভাবে পূজা করা হয়। *দেবীপুরাণে* উল্লিখিত সিংহের ধ্যানে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবীরা অবস্থান করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অরেকটি ধ্যানমন্ত্রে সিংহকে বিষ্ণুর একটি রূপ বলা হয়েছে। *কালীবিলাস তন্ত্রে* দুর্গার বাহনকে বলা হয়েছে বিষ্ণুরূপী সিংহ। *কালিকা পুরাণ* অনুসারে, দুর্গার বাহন হওয়ার জন্য শিব শবদেহ, ব্রহ্মা রক্তপদ্ম ও বিষ্ণু সিংহের মূর্তি ধারণ করেছিলেন। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ* অনুসারে, হিমালয় দুর্গাকে সিংহ দেন। *শিবপুরাণ* অনুসারে ব্রহ্মা শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করার জন্য দুর্গাকে সিংহ দেন। *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে, দুর্গার ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়। *দেবীপুরাণ* অনুযায়ী, বিষ্ণু দুর্গার বাহন সিংহকে নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সিংহে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল।

মহিষাসুর

মহিষাসুর অসুর অর্থাৎ দেবদ্রোহী। তাই দেবীপ্রতিমায় দেবীর পদতলে দলিত এই অসুর 'সু' এবং 'কু' র মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দ্বে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দের ভাষায়, 'সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট, ভয় ভীতি, আপদ বিপদ– এ সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরমকরুণাময়ী মা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করছেন।'

তবে অসুর হলেও দুর্গোৎসবে মহিষাসুরেরও পূজার চল আছে। *কালিকা পুরাণ* অনুসারে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নিজের মৃত্যুদৃশ্য স্বপ্নে দেখে ভীত মহিষাসুর ভদ্রকালীকে তুষ্ট করেছিলেন। ভদ্রকালী তাঁকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিলেও তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বরদান করতে উচ্ছুক হন। মহিষাসুর দেবতাদের যজ্ঞভাগ বর চাইলে দেবী সেই বর দিতে অস্বীকৃত হন কিন্তু মহিষাসুরকে এই বর দেন যে যেখানেই দেবী পূজিতা হবেন সেখানেই তাঁর চরণতলে মহিষাসুরেরও স্থান হবে।

গণেশ

গণেশ কার্যসিদ্ধির দেবতা। হিন্দু পুরাণের নিয়ম অনুসারে গণেশের পূজা আগে না করে অন্য কোন দেবতার পূজা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। গণেশের বাহন মূষিক বা ইঁদুর। ইঁদুর মায়া ও অষ্টপাশ ছেদনের প্রতীক।

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী শ্রী, সমৃদ্ধি, বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতীক। শুধু ধনৈশ্বর্যই নয়, লক্ষ্মীচরিত্র ধনেরও প্রতীক। লক্ষ্মীর বাহন পেচক বা প্যাঁচা। রূপে ও গুণে অতুলনীয় এই দেবীর এমন কিম্ভূত বাহন কেন, সে নিয়ে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত। প্রথমেই স্মরণ রাখা কর্তব্য, হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও পেচককে লক্ষ্মীর বাহনের মর্যাদা দান করা হয়নি। এই বিশ্বাস একান্তই বাঙালি লোকবিশ্বাস। প্যাঁচা দিবান্ধ। মনে করা হয়, যাঁরা দিবান্ধ অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞ তাঁরাই পেচকধর্মী। মানুষ যতকাল পেচকধর্মী থাকে, ততদিনই ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে।

সরস্বতী

সরস্বতী বাণীরূপিণী বাগ্‌দেবী, তিনি জ্ঞানশক্তির প্রতীক। দেবীর হাতে পুস্তক ও বীণা। পুস্তক বেদ শব্দব্রহ্ম। বীণা সুর ছন্দের প্রতীক নাদব্রহ্ম। শুদ্ধ সত্ত্বপ্রাণে পূর্তি, তাই সর্বশুক্লা। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানময়ী প্রকাশস্বরূপা। জ্ঞানের সাধক হতে হলে সাধককে হতে হবে দেহ মন প্রাণে শুচি শুভ্র। সরস্বতীর বাহন হংস। হংস পবিত্রতার প্রতীক। সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিনে রাতে একুশ হাজার ছয়শো 'হংস' এই অজপা মন্ত্রজপরূপে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করতে না পারে, ততদিন হংসধর্মী হতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না। একারণেই দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।

কার্তিকেয়

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বা কার্তিক সৌন্দর্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক।

যুদ্ধে শৌর্য়বীর্য´ প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সাধক্লজীব নে এবং ব্যবহারিক জীবনে কার্তিকেয়কে প্রসন্ন করতে পারলে শৌর্য়বীর্য´ করতলগত হয়। কার্তিকেয়র বাহন ময়ূর। সৌন্দর্য ও শৌর্য– কার্তিকেয়র এই দুই বৈশিষ্ট্যই তাঁর বাহন ময়ূরের মধ্যে বিদ্যমান।

মহাস্নান

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল মহাস্নান। মহাসপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নানের পর মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিনও পূজার মূল অনুষ্ঠান শুরম্নর আগে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপ্রতিমার সামনে একটি দর্পণ বা আয়না রেখে সেই দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিমার প্রতিবিম্বে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে স্নান করানো হয়। মহাস্নানের সময় শুদ্ধজল, নদীর জল, শঙ্খজল, গঙ্গাজল, উষ্ণ জল, সুগন্ধি জল, পঞ্চগব্য, কুশ ঘাসের দ্বারা ছেটানো জল, ফুলের দ্বারা ছেটানো জল, ফলের জল, মধু, দুধ, নারকেলের জল, আখের রস, তিল তেল, বিষ্ণু তেল, শিশিরের জল, রাজদ্বারের মাটি, চৌমাথার মাটি, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, গজদন্তমৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, নদীর দুই তীরের মাটি, গঙ্গামাটি, সব তীর্থের মাটি, সাগরের জল, ঔষধি মেশানো জল, বৃষ্টির জল, সরস্বতী নদীর জল, পদ্মের রেণু মেশানো জল, ঝরনার জল ইত্যাদি দিয়ে দুর্গাকে স্নান করানো হয়।

কুমারী পূজা

কুমারী পূজা হল তন্ত্রশাস্ত্রমতে অনধিক ষোল বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। বিশেষত দুর্গাপূজার অঙ্গরূপে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা এবং অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে এবং কামাখ্যাদি শক্তিক্ষেত্রেও কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে কুমারী পূজার প্রচলন কমে গেছে। বাংলাদেশে সুদূর অতীত থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন ছিল এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় *কুমারী পূজা প্রয়োগ*গ্রন্থের পুঁথি থেকে। রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে। প্রতিবছর দুর্গাপূজার মহাষ্টমী পূজার শেষে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে মতান্তরে নবমী পূজার দিনও এ পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সন্ধিপূজা

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অধ্যায় হল সন্ধিপূজা। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ পূজা, এই পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট নিয়ে মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ স্থলে এই পূজা, তাই এর নাম সন্ধিপূজা অর্থাৎ সন্ধিকালীন পূজা। এটি দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ, এইসময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়ে থাকে। এই পূজা সম্পন্ন হয় তান্ত্রিক মতে। এই পূজায় দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়। সন্ধিপূজায় পশুবলি হয়– সেই বলিকৃত পশুর মাংসূর ন্ধির (মাংস ও রক্ত) এবং কারণ (মদ) প্রদান করা হয় দেবীর উদ্দেশ্যে।

অপরাজিতা পূজা

অপরাজিতা পূজা দুর্গাপূজার একটি অঙ্গ। দুর্গার অপর নাম অপরাজিতা। তবে এই দেবীর মূর্তি অন্যরকম। ইনি চতুর্ভূজা– হাতে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রা। গায়ের রং নীল, ত্রিনয়না ও মাথায় চন্দ্রকলা। বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জনের পর পূজামণ্ডপের ঈশানকোণে অষ্টদল পদ্ম এঁকে অপরাজিতার লতা রেখে এই দেবীর পূজা করা হয়। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, 'ইনি বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী ও শিবশক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা।'

শরৎকালীন দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর প্রধান উৎসব। বাংলা পঞ্জিকার আশ্বিন বা কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বরঅ ক্টোবর মাসে) এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে রাবণ বধের জন্য রামের দুর্গাপূজার পৌরাণিক কাহিনিটি উল্লেখিত হয়েছে। দুর্গার পূজা বসন্তকালের উৎসব হলেও রাম শরৎকালে তাঁর পূজা করেছিলেন। এই পূজা অকালবোধন নামে পরিচিত। তাই বাসন্তী পূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয়া দুর্গাপূজাই মহাসমারোহে পালিত হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গাপূজা পালিত হয়। বাঙালিরা এই উৎসবকে হিমালয়ে দেবী দুর্গার বাপের বাড়ি ফেরার অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখেন। বাঙালি সমাজে এই পূজা উপলক্ষে নতুন পোশাক পরার চল রয়েছে। পূজার সময় মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শনও বাঙালিদের এক বিশেষ প্রথা।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘটনাপঞ্জি ❖ অক্টোবর

লালন ফকির

- ০১ অক্টোবর ১৯০৬ ❖ শচীব দেববর্মণের জন্ম
- ০২ অক্টোবর ১৮৬৯ ❖ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
- ০৮ অক্টোবর ১৯৩৬ ❖ মুন্সী প্রেমচাঁদের মৃত্যু
- ১০ অক্টোবর ১৯১৬ ❖ সমর সেনের জন্ম
- ১৩ অক্টোবর ২০০৬ ❖ প্রতিভা বসুর মৃত্যু
- ১৪ অক্টোবর ১৯৩০ ❖ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম
- ১৫ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্ম
- ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ ❖ লালন ফকিরের জন্ম
- ১৯ অক্টোবর ১৯২৪ ❖ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম
- ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু
- ২৩ অক্টোবর ২০১২ ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু
- ২৮ অক্টোবর ২০০২ ❖ অন্নদাশঙ্কর রায়ের মৃত্যু
- ৩০ অক্টোবর ১৯০১ ❖ সুধীন্দ্রনাথ দত্তর জন্ম
- ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ ❖ সুকুমার রায়ের জন্ম
- ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ❖ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু

ছোটগল্প

ভবঘুরের ভালবাসা

দীপিকা ঘোষ

অনিমেষ লাহার ভ্রমণযাত্রা এবার যে দীর্ঘায়িত হবে সঙ্গের স্যুটকেস দেখেই অনুমান করেছিল চব্বিশ বছরের ট্যাক্সি ড্রাইভার গদাই সোম। কারণ সংক্ষিপ্ত যাত্রায় বরাবর কেবল একটি হাতব্যাগই সঙ্গে থাকে তার। আজ হ্যান্ডব্যাগের বদলে ছোটখাটো স্যুটকেস। কৌতূহল সামলাতে না পেরে গদাই তাই জিজ্ঞেস করে বসল– এবার বুঝি দূরে কোথাও যাচ্ছেন বাবু? সেই রকমইতো ইচ্ছে আছে। রিটায়ার করা বৃদ্ধ মানুষ, শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে কী করব বল? অনিমেষ ট্যাক্সিতে গদাইয়ের মাল তোলা পলকহীন চোখে দেখতে দেখতে সংক্ষেপে জবাব দিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, ঠিক করেছেন? না রে গদাই। আগে ট্রেন স্টেশনে গিয়ে দেখি কোথাকার টিকেট সস্তায় মেলে, তবেই তো সিদ্ধান্ত। কতকাল বেঁচে থাকতে হবে জানা তো নেই, তাই বড় হিসেব করে চলতে হয়। গদাই আর প্রশ্ন করে না এরপরে। জানে, উত্তর মিলবে না। চার বছরের গভীর পরিচয়ে অনিমেষ লাহার নাড়িনক্ষত্র মুখস্থ হয়ে গেছে তার। জানা আছে, তার ভবঘুরে জীবনের ভ্রমণযাত্রায় স্থান কোনদিনই পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। পথের নেশায় বেরিয়ে সুবিধেমত যে কোন জায়গায় গিয়ে উঠতে পারলেই হল। গদাই ট্যাক্সি চালাতে চালাতে কিছুক্ষণ পরে পেছনে বসা মানুষটির উদ্দেশ্যে কথা ছুঁড়ে দেয় ফের–

মাঝখানে দুটো বছর পেরিয়ে গেছে। গদাই সোম বিয়ের পরে এখন এক সন্তানের বাপ। বাপমায়ের বড় সাধ, তাদের অন্য সন্তান দুটো বড় ছেলের কাঁধে চড়েই বিস্তর লেখাপড়া শিখে স্বর্গাদপি জনক-জননীর মুখ উজ্জ্বল করে মানবজীবন ধন্য করুক। কিন্তু এমন সাধে ঘোরতর আপত্তি আছে অতি সাধের পুত্রবধূর। এমনিতেই সংসারে তার আবির্ভাবের পরে অশান্তির আগুন নিত্যই জ্বলছে রারণের চিতা হয়ে। রুটিনমাফিক সেই নৈমিত্তিক আগুন আজও সকাল থেকে জ্বলছিল শাশুড়ি-বধূর পরিচিত সংঘর্ষ ঘিরে।

আমাদের পাড়ায় নতুন একটা ক্লাবঘর খুলেছে মাস ছয়েক হল। ষাট থেকে আশি, সব বয়সের ভদ্রলোকেরাই সেখানে আসা যাওয়া করেন। ভাল এক লাইব্রেরির ব্যবস্থাও সরকার রেখেছেন শুনেছি। ক্লাবটির নামকরণ হয়েছে– 'জ্ঞানীদের জলসাঘর'। আপনি ফিরে এলে নিয়ে যাব একদিন। আচ্ছা, যাব একদিন তোর সঙ্গে। অনিমেষের ভাড়া বাড়ি থেকে রেল স্টেশনের দূরত্ব মাত্রই মাইল দুয়েকের পথ। রিক্সায় এলেই চলে। কিন্তু দশ টাকার বদলে বাড়তি টাকা খরচা করে গদাইকে নিয়ে আসাই বরাবর পছন্দ তার। তার ভবঘুরে জীবনের ছন্নছাড়া মন ছেলেটি কখন যে অজানা আকর্ষণে অলক্ষ্যে তার দিকে বেঁধে নিয়েছে, জানা নেই অনিমেষের। শুধু জানা আছে, দেখা হলেই বুকের তলায় কেমন এক অপার স্নেহের ঢেউ নিরন্তর ভাললাগায় সুখসুখ খেলা করে। ক্লাশ সেভেন অবধি বিদ্যে হলেও গদাইয়ের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব নেই। তাই অভাব যে তার নিত্য সঙ্গী, সংসারী মানুষদের মত সারাক্ষণ পাওয়ার মন্ত্রণা নিয়ে সেটা একবারও সে মনে করিয়ে দিতে চায় না অনিমেষ লাহাকে। তাছাড়া স্বল্পবাক অনিমেষের দু'চার কথাতেই কাজ চলে যায় তার সঙ্গে। তুলোধুনো করে আজও পর্যন্ত কোন কথাই বোঝাতে হয়নি তাকে, সেটাও তার ভাললাগার আরও একটি কারণ হয়তো। নিজের ভবঘুরে জীবনের ঘড়িঘড়ি যাত্রাপথে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছনর কাজে গদাইয়ের তাই প্রতিবারই ডাক পড়ে।

আজ অবশ্য স্টেশনে নেমে এক অদ্ভুত কথা বলে বসল গদাই। বলল– বাবু, আমার খুব ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে আপনার মত পথের পথিক হয়ে যাই। পথ আমাকেও খুব টানে বাবু! বুকের ভেতর কেমন অস্থির অস্থির লাগে সংসারের রশিতে নিত্যদিন বাঁধা পড়ে থাকলে! অনিমেষ ভাড়া মেটাতে ওয়ালেট খুলে টাকা বার করছিলেন। কথা শুনে বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎই শব্দ করে হেসে উঠে বললেন– সে কি রে পাগলা, আমার ব্যামো তোকেও ধরল নাকি? ভবঘুরে রোগও যে ছোঁয়াচে হয় এ তো জানা ছিল না গদাই! হাসির কথা নয়, সত্যিই বলছি বাবু! হাসি থামিয়ে অনিমেষ এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন– তুই যে সত্যি বলছিস, সে আমি জানি। তাই তো বলছি, চারপাশে এত পরিচিত জনমানব থাকতেও শুধু তোকেই কেন ভাল লাগে আমার। আসলে তুই আমারই মত পথের প্রেমিক। আমায় সঙ্গে নেবেন বাবু? খবরদার অমন কথা বলিসনে গদাই! আমি না হয় সব ছেড়েছি বলে দায়দায়িত্ব কিছু নেই। কিন্তু তোর? সংসারে অসুস্থ বুড়ো বাপ! তার ওপর মা, ছোট দুটি ভাইবোন! ট্যাক্সির মালিক তো আর বসিয়ে তোকে মাইনে দেবে না? সেসব পরে ভাবা যাবে! না গদাই সে হয় না। রোজগার না করলে যে বড় পাপ হবে বাপ! তাছাড়া পথের নেশার জোর মহাসাগরের গোপন ঢেউয়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী! একবার টেনে নিলে আর ঘরের বাঁধন পরতে দেয় না! সংসারের বাঁধন পরে কাজ নেই বাবু! ওতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে! সারাদিন পরিশ্রমের পরে ঘরে ফিরে সুখ কই? সবার সব চাওয়াগুলো একসঙ্গে এমনভাবে ভেতরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেয় যে...! সংসারের অমনই নিয়ম গদাই! অচেতন হয়ে থাকলে মহাসুখ! কিন্তু যেই চৈতন্য হবে, অমনই পরিবারের হাজার চাওয়া ছেঁকে ধরবে চারপাশ থেকে! তারা মধুর বদলে বিছুটি হয়ে শুধু হুল ফুটোবে সারাক্ষণ! জীবন দর্শনের গভীরতা যেমনই থাক, অনিমেষের কোন কথাই অনধিগম্য থাকে না গদাই সোমের কাছে। সে মুখের চেহারা আরও বেশি বিমর্ষ করে বলে– তার ওপর মা আবার ক'দিন ধরে বায়না ধরেছে বিয়ের জন্য। বলছে, তোর অসুস্থ বাপটা কবে মরে যায় ছেলের বউয়ের মুখ দেখতে তার বড় সাধ গদাই! তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে কর! অনিমেষ ধৈর্য ধরে শুনতে শুনতে এতক্ষণ বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলছিলেন। এবার সব গাম্ভীর্য লোপাট করে আরেক প্রস্থ হেসে উঠে বললেন– বোঝো অবস্থা! নিজে খেতে পায় না তায় আবার শঙ্করীকে ডাকে! এরপরে বলবে, নাতিপুতির মুখ না দেখলে মরেও শান্তি পাব না! সংসারীদের ওই এক রোগ! মরার দিন যত ঘনাবে, মনে ততই নিত্য নতুন বাসনা গজাবে! এরপরে নাতিপুতি হলে দেখবি, তাদের বিয়ে অবধি বেঁচে থাকবে না বলে শতবার দুঃখ প্রকাশ করবে!

এরপরে মাঝখানে দুটো বছর পেরিয়ে গেছে। গদাই সোম বিয়ের পরে এখন এক সন্তানের বাপ। বাপমায়ের বড় সাধ, তাদের অন্য সন্তান দুটো বড় ছেলের কাঁধে চড়েই বিস্তর লেখাপড়া শিখে স্বর্গাদপি জনক-জননীর মুখ উজ্জ্বল করে মানবজীবন ধন্য করুক। কিন্তু এমন সাধে ঘোরতর আপত্তি আছে অতি সাধের পুত্রবধূর। এমনিতেই সংসারে তার আবির্ভাবের পরে অশান্তির আগুন নিত্যই জ্বলছে রারণের চিতা হয়ে। রুটিনমাফিক সেই নৈমিত্তিক আগুন আজও সকাল থেকে জ্বলছিল শাশুড়ি-বধূর পরিচিত সংঘর্ষ ঘিরে। দুপুরবেলা ছেলে কাজে বেরিয়ে যেতে পুত্রবধূ তাই অনাবশ্যক শাশুড়ির আস্তানায় রণচণ্ডীর বেশে প্রবেশ করতেই সন্ত্রস্ত শাশুড়ি ব্রজবালা সোম তিক্তস্বরে জানতে চাইল– আবার কী চাই? জবাবে পুত্রবধূ তার বাঁজখাই গলায় আরও খানিকটা ধার দিয়ে বলল– তোমার কাছে আবার কী চাইব? আছে কী যে দেবে? শুধু বলতে এসেছি, ছেলেমেয়েদের অত পড়াশুনোর শখ থাকলে নিজেরাই রোজগার করে আনো না বাপু! সারাক্ষণ বড় ছেলেরই রক্ত চুষে খাচ্ছ কেন? একজন তো বছর ধরে বিছানায় শুয়ে হররোজ নিজের ছেরাদ্দ করে মরছে! আর তুমি? আমার কচি ছেলেটার দুধ কেনার পয়সা জোটে না, ওদিকে বুড়ি ঘাটকির কেবল নিত্যনতুন বায়না! লজ্জা করে না আদিখ্যেতা করতে? ইয়ার্কি নাকি? শাশুড়ির গলাতেও ঝঙ্কার উঠল– কী! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! গদাই ফিরুক আজ, তারপরে তোর ব্যবস্থা করছি! সোজা ঘাড় ধরে বাপের বাড়ি যদি না পাঠিয়েছি তো আমার নাম বোরজোবালা নয়, দেখে নিস! সুযোগ পেয়ে আমার সোনার পুত্তুরের কাঁধে তোর শয়তান বাপ ছলেবলে নিজের শাকচুন্নী মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়েছে, তায় আবার বড় বড় কথা? উত্তরে পুত্রবধূও জ্বলন্ত মশাল হয়ে উত্তাপ বিকিরণ করে বলল– আমি যদি শাকচুন্নী হই তুই তাহলে পেত্নী রে বোরজোবালা! যা আয়নায় গিয়ে দেখে আয়! তাছাড়া আমি কারুর কাঁধে গিয়ে বসিনি! ছলেবলে কৌশলে তোরাই আমার বাপের ঘাড় ভেঙে কাড়িকাড়ি টাকা গিলছিস বুড়ি মুটকি! আমি বুড়ি মুটকি? তোর মা কোন্ সুন্দরী শুনি? হে ভগবান! আমার গদাইয়ের জন্য শেষে কিনা একটা কালকেউটে গছিয়ে দিলে গো ঠাকুর? কী পাপ করেছিলাম যে... কান্না গলার কাছে উঠে আসায় ব্রজবালাকে এখানেই থামতে হল বাধ্য হয়ে।

কিন্তু পুত্রবধূ তখনো শক্তিশেল। তার হৃৎপিণ্ডের ভেতর জুড়ে প্রতিশোধের ঘৃণার আগুন দাউদাউ করে নানা খেলায় তরঙ্গায়িত তখন। সেই তরঙ্গে ভেসে ব্রজবালাকে আরও একবার বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে

সে উদ্যত হচ্ছিল উৎসাহের অগ্নিশিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে। সহসা চোখে পড়ল, গদাই কোন্ আকস্মিক কারণে ঘরের দরজায় গম্ভীর মুখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। স্বামীকে দেখেই মন্ত্রমুগ্ধ সাপিনীর মত মুহূর্তে ফণা গুটিয়ে ভদ্র হয়ে গেল গদাইয়ের বউ। ভাগ্যদোষের বিড়ম্বনায় ব্রজবালা তখনও অভিশম্পাত করছিল মুখরা পুত্রজায়াকে। এবার চোখের সামনে ছেলেকে উপস্থিত দেখে বুকের হুতাশন চতুর্গুণ বাড়িয়ে কপালে চাপড় মেরে ভগ্ন গলায় বলল– ওরে গদাই, তোর বউ বলছে আমি নাকি পেত্নী! তোর রক্ত চুষে খাচ্ছি! হা ভগবান, এমন কথাও শুনতে হল! বেঁচে থেকে আর কী হবে বাবা? একটু বিষ কিনে দে, তোর বাপ-ভাইবোনদের নিয়ে একইসঙ্গে মরি! গতর জুড়োক তোদের! গদাইয়ের সহ্যবোধ অনেক আগেই সীমা ছাড়িয়েছিল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল– আচ্ছা মা, তোমরা কি সত্যিই চাও না আমি ঘরে তিষ্ঠোই? রোজ রোজ এ রকম হলে কী করি বল তো? কেন তোমরা জোর করে আমার বিয়ে দিয়ে... কথা শেষ না করেই সে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল বাইরে। পুত্রবধূ সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে বলল– কত রঙ্গই জানো মাইরি! ছেলে বিষ এনে দেবে, তবে গুষ্ঠিসুদ্ধ মরবে! জগতে সব মানুষের মরণ যেন ওই বিষ গিলেই হচ্ছে! হুঃ!

গদাই সোম দায়িত্বশীলতার কোন দোহাই মেনেই এরপরে আর ঘরে ফেরেনি কোনদিনও। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে ভালবাসার মানুষটির দরজায় সন্ধ্যার আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সব শুনে অনিমেষ আপত্তি তুলেছিলেন তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে– আমার কাছে তোর থাকায় কোন আপত্তি নেই গদাই! কিন্তু তাই বলে এই যে ড্রাইভারের বাঁধা চাকরি ছেড়ে তুই একেবারে সংসার পরিত্যাগ করে চলে এলি, এটা কি ভাল হল? ওদের কী হবে? চোখের জলে গাল ভাসিয়ে গদাই উত্তর দিয়েছিল– সংসার কি কারুর জন্যই থেমে থাকে বাবু? ও ঠিক চলে যাবে! আপনিও তো সংসারের দায়ভার কাঁধে নেননি, তাতে কি অচল আছে কোন কিছু? অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গেই এই জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেননি। কিছু সময় পরে স্বস্তি নিয়ে বলেছিলেন– কিন্তু আমার পরিস্থিতি তো তোর মত ছিল না গদাই। আমার উচ্চশিক্ষিত বাবা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। দাদারাও তাই। ছেলেবেলা থেকে আমি সংসার অনভিজ্ঞ, উদাসীন বলে তাদের ভরসাস্থল কখনো ছিলাম না। পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম বলেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে ভাল চাকরি করেছি। কিন্তু সে অর্থে তাদের প্রয়োজন কিংবা আকাঙ্ক্ষা কোনটাই ছিল না। বাবুর এমন মন্তব্যে গদাই নীরব থেকেছিল অনেকক্ষণ। পরে ধীরে ধীরে নিবিড় প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নিয়ে বলেছিল– আমি জানি না বাবু আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আপনার টাকা পয়সা অর্থসম্পত্তি কোন কিছুতেই আমার লোভ নেই! শুধু আপনার কাছে থাকার লোভ, কথা শোনার লোভ সেই প্রথম থেকেই টের পেয়েছি। আপনাকে দেখে প্রথমবারই মনে হয়েছে, রক্তের সম্পর্কের পরিবার থেকে আপনি আমার অনেক বেশি আপনার! ওখানে থাকলে বাঁচব না বাবু!

গদাইয়ের ব্যাকুলতায় আর্তি ঝরেছিল। স্ফটিক স্বচ্ছতায় জীবনের সত্যতা উন্মোচিত হয়েছিল এমনভাবে, যাতে উচ্চশিক্ষিত অনিমেষ লাহা তাকে পারেননি তাড়িয়ে দিতে। কে জানে হয়তো আসল মানিক চেনার অভিজ্ঞ দৃষ্টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংসার অনভিজ্ঞ মানুষের সহজাত বলেই গদাই আর অনিমেষ পরস্পরকে চিনতে পেরেছিল কিনা। তবে ভবঘুরে অনিমেষ সংসারী না হলেও সংসারের বাস্তব প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি কোনদিনও। পরেরদিন সকাল হতেই বলেছিলেন– গদাই, আমরা এখান থেকে চলে যাবার আগে একটা কাজ করে যেতে হবে বাবা। রিটায়ারমেন্টের পরে যে টাকাটা এতদিন আমার কাজে লাগত সেটা এবার প্রতিমাসে তোর বাড়ির ঠিকানায় যাবে। বাড়িতে চিঠি লিখে এই খবরটার সঙ্গে তোর গৃহত্যাগের কথাও জানিয়ে দে। নইলে সবার বড় চিন্তা হবে! কিন্তু আপনার তাহলে কী করে চলবে বাবু? তুই যে কাল রাতে বললি, আমায় উপার্জন করে খাওয়াবি? বলেই নির্মল হাসিতে জোরে হেসে উঠলেন অনিমেষ।

গদাই জীবনের সফলতম আনন্দে এবার অবিরল কেঁদে উঠল বাঁধভাঙা বন্যার কুলুকুলু স্রোতের মত। সে কান্না এমন যা সুখদুঃখ বেদনা জ্বালা সবকিছুকেই কেবল আনন্দের স্রোত করে ভাসিয়ে দেয় জীবন প্রাঙ্গণভরে। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে অনিমেষ তার মাথায় সস্নেহে একটা নাড়া দিয়ে বললেন– বাবুর মত ভবঘুরে হতে চাইলে অনিশ্চিত জীবনকে ভয় পেলে চলবে গদাই? ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে। কাঁদিসনে। কাঁদিসনে। ওঠ। উঠে সব যোগাড়যন্তর করে নে। গদাই এমন জবাবে আরও একবার হুহু করে কেঁদে উঠে বলল– কান্না যে আমি থামাতে পারছি না বাবু! কেঁদে যে সুখ আছে, এভাবে জানা ছিল না আগে!

গদাইয়ের কথা শুনে অনিমেষের বুকের তলায় প্রশান্তির আস্তরণ পড়ছে যেমন বর্ষা শেষে ফসলি মাঠের বুক জুড়ে পলিমাটির পরশ পড়ে। যার প্রতিটি স্পর্শের স্তরে স্তরে লুকিয়ে থাকে, গুচ্ছ গুচ্ছ ভবিষ্যৎ ফসলের নিভৃত জীবনের স্বপ্ন। অনিমেষ জানেন, গদাইয়ের এই কান্না তার বহুকালের জীবনযন্ত্রণা থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির আস্বাদন। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি এবার শরীর জুড়েও ছড়াতে চাইছে তার। সেই সঙ্গেই সুখময় অনুভবে ভাবছেন– ভবঘুরের উত্তরাধিকার থাকে কি কখনো? যে উত্তরাধিকার গদাইয়ের মত সন্তান হয়ে স্নেহ জাগিয়ে তোলে অন্তর জুড়ে?

দীপিকা ঘোষ কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

কবিতা

না বলা কথার মালা

শুক্লা সান্যাল

আমার না বলা কথাগুলো
বাতাস হয়ে যখন তোমায়
জড়িয়ে ধরে...
তুমি বুঝতেই পারো না সে
আমার অব্যক্ত ভালবাসার ছোঁয়া।

অসময়ে বৃষ্টি এসে যখন তোমাকে
ভিজিয়ে দিয়ে যায়...
তুমি দেখতেই পাও না
সে আমার বুক ভাঙা
কান্নার জল।

গোধূলির রঙে রাঙা যখন
পশ্চিম আকাশ
তুমি ভাবতেও পারো না...
আমি তখন তোমার ভালবাসায়
সিঁদুররাঙা মেঘ।

সন্ধ্যেবেলা নাটমন্দিরের চাতালে বসে গ্রামবৃদ্ধরা
যখন আলোচনা করে অমর প্রেমের কথা
তুমি জানতেও পারো না...
আমি সন্ধ্যামণি ফুল হয়ে
সুবাস ভরে দিচ্ছি তোমার বুকে।

রাত্রি যখন নিশুত অন্ধকার
ঘুমপরীরা চলে নিরুদ্দেশে
তুমি শুনতেই পাও না...
আমি তখন ঘুমপাড়ানি গান
তোমার চোখে স্বপ্ন দিচ্ছি এঁকে।

শুক্লা সান্যাল ভারতের কবি

পরিযায়ী মন

চপল বাশার

বাউল মনটা ছুটে চলে যায়
মধুমতি তীরে হিজলের বনে
ঘুঘুরা যেখানে ডাকে অবিরাম
একতারা সুর পাখিদের গানে

টাংগুয়ার বিলে পরিযায়ী মন
ছুটে যায়, করে খেলা শান্ত জলে
বালিহাঁসের ঝাঁক করে জলকেলি
তারপর উড়ে যায় আবার আকাশে

মনটা কখনও যায় ইনানি সৈকতে
বালুকাবেলায় খোঁজে রঙিন ঝিনুক
ফেনার মুকুট নিয়ে ধেয়ে আসে ঢেউ
বালির লিখন সব যায় ধুয়ে মুছে

বাউল মনটা শুধু ছোটে অবিরাম
কখনও বাঁয়ে, ডানে কিংবা সোজাসুজি
পাখির মত মেলে দেয় ডানা
পরিযায়ী মন খোঁজে আপন ঠিকানা

রোদের পাঞ্জেরি

মোমিন মেহেদী

আলোর বিপরীতে অন্ধকার
হিজলতলায় আমাদের পা থাকলেও
ঘৃণা থাকে হিজড়াদের জন্য; নগণ্য
মানুষ হয়েও অসাধারণ হওয়ার অভিনয়ে
ব্যস্ত আমাদের দেহ।
ভালবাসার রঙ থাকুক আর নাই বা থাকুক
থাকে কষ্টের রসদ সীমাহীন; থাকে বেদনার
রাশভারি রোদ; থাকে কলুষিত বর্তমান।

অতীতের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসা সর্বনাশকে
প্রতিরোধ করতে পারুক আর না পারুক
অসংখ্য সর্বনাশের জন্ম দিতে তৈরি রাজনৈতিক ভ্রূণ।

দু'জনের ডিম্বথলিতে থাকে কালোর আবাদ
থাকে কষ্টের রিবন; থাকে কালের রঙ্গলীলা
থাকে কংসবণিকের রাত; এর বাইরে বেরুতে
হবে আজ; জাগতে হবে বিনম্র ভালবাসায়–
শ্রদ্ধায়– চেতনায়– আরো একবার।

যাতে করে রোদ আসে
আলো আসে; স্বেচ্ছাশ্রমের টানে
যাতে তীর গড়ার রঙিন নেশায় আরো
একধাপ এগিয়ে যেতে পারে রোদের পাঞ্জেরি...

প্রতীকি
স্বপন নন্দী

কপালে টিপ, লাল টিপ
সিঁদুর নয়, আবীর নয় কেবলই টিপ–
বুকের মাঝে আনে শব্দতর ঙ্গ
ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্।
পূর্ণিমার জলছাপ মুখচ্ছবি
ভোরের লাল আলো– কপালের টিপ
বুকের মধ্যে জাগে আলোড়ন– ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্।

নরম নরম ঘাস বুকে
ফড়িং খেলা–
অল্পক্ষণের শেষ খেলা
লাল হয়ে চলে যায়
সূর্যকণার শেষ রেখা
অদ্ভুত এ দাগ
সোনালি সব ভাবনায়।
কপালের টিপে সুখ আনে
সরস জোরালো কম্পনে
টিপটা– ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্।

ভালবাসার ভাষা
রেজাউদ্দিন স্টালিন

জগতের আছে একটিমাত্র ভাষা
ভালবাসা ভালবাসা
জ্বলন্ত সব চাকার ওপর দিয়ে
ভালবাসা তার ব্যাপ্তিকে যায় নিয়ে
নীরবতা দিয়ে ঢাকা তার শব্দেরা
বেহুলার চোখে লখিন্দরের ফেরা
না বোঝা কথার যত অবগুণ্ঠন
আর নিভে আসা ঝাড়বাতি দশানন
ভাস্মভূব নের রহস্যচাবিকাঠি
চোখ ও পলক দুজনাই সহপাঠী
মুক্ত মাঠের রাখালছেলেরা জানে
মূক ভাষা পায় কতটা অস্মজানে
প্রিয়তম জানে প্রতীক্ষা কত দামি
বলিদান বোঝে শাশ্বত সংগ্রামী
কত বিজ্ঞানী দার্শনিকের মত
জান্মঅজানার দোলাচলে বিভ্রান্ত
কত অভিবাসী সাত সমুদ্র পারে
কোনমতে বাঁচে দোভাষীর কারাগারে
আর মুক্তির প্রসঙ্গ যদি আসে
তারাই স্বাধীন যারা শুধু ভালবাসে
জীবন ও জগতে একটাই পরিভাষা
ভালবাসা ভালবাসা।

বাগান
মাহফুজ পারভেজ

ধূলিস্নাত যৌবন পেরিয়ে তোমার বাগানে আসি
একটি গোলাপ খুলি
মনে হয় যেন আমি খুলছি নক্ষত্র
পায়ে পায়ে মিশে থাকে পৃথিবীর ঋণ:
আজন্মের তীব্র রোদ থেকে মুখ ঢাকি
মহাভারত থেকে উঠে আসা তোমার আঁচলে
খুঁজি অবশিষ্ট আফিম ও মাংসের ঝোল
তারপর ফিরে যাই তোমার বাগানে...
কিংবা ঘটনাগুলো চতুর বিড়াল হয়ে
ঘুরছে তোমার বাগানের প্রতিটি গোলাপে
খ্যাতি আর প্রবঞ্চনা থাকে দুপুরের মুখোমুখি...
তুমি আর আমি নিশীত মাতাল স্রোতে
রাস্খাকে নদীতে সাজিয়ে রাখি স্মৃতির পাথর চোখে
আমাদের শরীরের হিব্রু, পর্তুগিজ ও ইডিডে...

হায়! কেউ জানল না
ঘটনাগুলো নিখাদ আমাদের ছিল
আর কবিতাগুলো এখন রয়েছে আমার কাছে–
বিদ্যুৎরেখার মত ধরে আছি কবিতা এবং
একটি উত্তরহীন প্রশ্ন:
ইউরোপ ধরে আছে যেরকম অ্যালবের কাম্যুকে
আমি কবিতায় ধরে রেখেছি কাকে?
আমি তার একটি সুদীর্ঘ কালো চুল ছাড়া
অন্য কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারব না:
ভালবাসা কী মরে? কাউকে মারে?

জানা যেত, তোমারআমার যদি দেখা হত আবার বাগানে...

সহজ স্বীকারোক্তি
অনন্য কামরুল

চাবি হারানোর মত তোমাকে ভুলে গেলে আমার
আর আশ্রয় মেলে না কোথাও। তালা ভাঙার শোক
ভাবনায় ফোটায় না বসন্তেও কোন কিংশুক
বৈরী তীর মাছের পোনার মত আসে বেশুমার।
তোমার স্পর্শ মমি করে রেখেছি স্বপ্নপিরামিডে
হয়তো কোন এক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক পাবে খোঁজ
তোমার পূজার ফুল রেখে পায়ে মন্ত্র গাবে রোজ
বাজাবে তোমাকে দ্বহা তে হারমোনিয়ামের রিডে।
আমার ফসিল দেহকণা ফিনিক্স হয়ে আবার
তোমার হাতের রেখার মাঝে খুঁজে নেবে ঝিনাই
নদীর উদ্বিগ্ন ছাপ; কয়েনের মত চাঁদটাই
বলে দেবে গাঁদার মত টিপটা আমার রাধার।
তোমায় বুকেতে রাখি যেন বিসমিল্লার সানাই
ঘুম ভেঙে তুমি হও প্রথম গান সুর সাধার।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুনীলে সুনীল তুমি

গাজী আজিজুর রহমান

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে যখন শক্তি ও সুনীল উভয়ই অতিক্রম করছেন জীবনের মূল্যবান পঞ্চাশতম বর্ষা-বসন্ত– তখন শক্তি পেয়ে গেছেন *আনন্দ* ও *একাডেমি পুরস্কার* এবং সুনীল পেয়েছেন *আনন্দ* ও *বঙ্কিম পুরস্কার*। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান দুই কবি ইতোমধ্যে জীবনাচারে সৃষ্টিতে প্রায় কিংবদন্তিতুল্য হওয়ায় তাদের ঘিরে চলছে নিত্য পুরস্কার ও সংবর্ধনা দেওয়ার পালা। এই উপলক্ষ্যে সে সময় *দরবারী সাহিত্য*-র আয়োজনে শক্তি ও সুনীলকে আলাদাভাবে দু'টি সংবর্ধনা ও দু'টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়– শক্তি এবং সুনীল সংখ্যা ১৩৯০। এই সংখ্যা দু'টি প্রমাণ করবে (লেখক তালিকা অনুযায়ী) এ সময় তাঁরা কতটা সমৃদ্ধ, জনপ্রিয় ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি ছিলেন, তুলনীয় হচ্ছিলেন যে-কোন তাবড় কবিদের সঙ্গে। সংখ্যা দুটোর তারকাখচিত লেখক-কবিদের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, রত্নেশ্বর হাজরা, সমরেশ মজুমদার, সাধনা মুখোপাধ্যায়, জীবন সরকার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। এঁরা দু'জন তখন এত লিখেছেন আর এত পরিচিত যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা না করলেও নিশ্চয়ই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দের সঙ্গে তুলনীয়। বিশেষত সুনীল তখন দুই বাংলাসহ ভারত ও বিশ্বের অনেক দেশে পরিচিত কবি।

পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সুনীলের কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ফিচার, ইতিহাস, ভ্রমণ, রম্যরচনা, অনুবাদ, শিশু-কিশোর রচনা ও নীললোহিতের সংখ্যা মিলিয়ে গ্রন্থসংখ্যা দেড় শতাধিক। এতে বোঝা যায় সৃষ্টি ও নির্মাণে সুনীল কত পারঙ্গম এবং দুর্বার গতিসম্পন্ন। সেই সুনীল আকাশের মত সুনীল গুণে গুণে অতিক্রম করলেন আরো আঠাশটি শীত-গ্রীষ্মের কাল। রচিত হল আরো দেড়শতাধিক গ্রন্থ।

বীট জেনারেশনের অন্যতম পুরোহিত অ্যালেন গীন্সবার্গের নাম শুনলে তখন চমকে ওঠে পশ্চিমাবিশ্ব। সেই গীন্সবার্গ প্রথম কলকাতা এলেন ১৯৬২-তে। এই তুখোড় কবির সঙ্গী কে? স্বভাবতই শক্তি ও সুনীল। কী কা-টাই না তাঁরা করলেন কলকাতাজুড়ে, হায়-হায় রব উঠল সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথের মত ভ্রমণ করলেন প্রায় অর্ধ পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন *নীললোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক*। প্রায় পঞ্চাশ বছর *কৃত্তিবাস* (১৯৫৩) সম্পাদনা করে সম্পাদনার জগতেও হলেন কীর্তিমান পুরম্নষ। জীবিকার জন্য বহু খ্যাতিমান মানুষের মত গৃহশিড়্গকতা থেকে শুরম্ন করে জীবন বীমা কোম্পানির অফিসার্স ট্রেনি, ইউনেস্কো বয়স্ক শিড়্গা প্রচার বিভাগের কর্মী, সরকারি অফিসের করণিকসহ *দৈনিক জনসেবা, আনন্দবাজার* ও *দেশ* পত্রিকার সহযোগী এবং সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর রয়েছে বিচিত্রধর্মী কাজের অভিজ্ঞতা। অন্তত দশটি ভাষায় অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই কবি। তাঁর গল্পকাহিনি যে কতটা সিনেমাটিক তার প্রমাণ মেলে পনেরোটি কাহিনি নিয়ে চলচিত্র নির্মাণে। সত্যজিৎ রায়, গৌতম ঘোষ, রাজা সেনের মত বিখ্যাত চিত্রনির্মাতারা তাঁর গল্পের চলচ্চিত্রকার। ছিলেন আনন্দপ্রিয়, ভ্রমণপ্রিয়, অভিযানপ্রিয় আর আড্ডায় ছিলেন গুরু-শিরোমণি। সব মিলে প্রেমেভালবাসায়ব ন্ধুত্বে খুব জমকালো, বর্ণাঢ্য, বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর বর্ণালি জীবন। তাঁর লেখার বিষয় ও শরীরে ছিল নতুনত্বের আকর্ষণ ও গন্ধ– যা তাঁকে তিরিশোত্তর কবিদের বলয় থেকে করেছিল আলাদা এবং কিছু ক্ষেত্রে অভিনবত্বে উজ্জ্বল।

জীবনের শুরু থেকেই সুনীল ছিলেন পলস্নবিত বৃক্ষের মত উৎফুল, উজালা ও ও অনুরক্ত। ভালবাসতেন চারপাশকে জাপটে বিকশিত হতে। বিশেষত জন্মস্থান, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ, তাদের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা ছিল তাঁর প্রিয় অনুষঙ্গ। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান স্মরণীয় ইতিহাসে। তিনি আমৃত্যু যত দূরেই যান বার বার ঘুরে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে প্রাণের টানে। শামসুর রাহমান থেকে সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, সমুদ্র গুপ্ত, হাবীবউলাহ সিরাজীসহ অসংখ্য কবিসাহিতি ্যকশি ল্পী ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়জন। বাংলাদেশ যেন ছিল তাঁর হাতের তালুর মত অতি পরিচিত, রক্তের মত রণিত, অবিচ্ছেদ্য এক আত্মীয়। তিরিশের কবিদের মত বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, রুগ্ন বা নিরম্নপায়, নির্জন নেতি নন্দিতও ছিলেন না স্বভাবেসংক লে। ভালবাসতেন হৈ চৈ, উথালপাথাল তা ণ্ডব, তুবড়ি ছোটানো। সেই স্বভাবে ভারি সুন্দর মিলে গেলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যেমন মিলেছিলেন র‌্যাঁবো-ভেরলেন, এসেনিনমায়া কোভস্কি, পল গ্যঁগা-ভ্যান গগ আর হাসানগুণ। বিগত শত কের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি যেন শক্তি- সুনী লের দশক, শক্তিসুনী লের কাল, শক্তিসুনী লের সংস্কৃতির কলকাতা। পঞ্চপা-বদের সংস্কৃতির কলকাতা প্রথম পাল্টে দিলেন শক্তি ও সুনীল। এই যৌথ কবিই গত পঞ্চাশ বছর শাসন করেছে কলকাতার সাহিত্যপাড়া।

বীট জেনারেশনের অন্যতম পুরোহিত অ্যালেন গীন্সবার্গের নাম শুনলে তখন চমকে ওঠে পশ্চিমাবিশ্ব। সেই গীন্সবার্গ প্রথম কলকাতা এলেন ১৯৬২-তে। এই তুখোড় কবির সঙ্গী কে? স্বভাবতই শক্তি ও সুনীল। কী কা-টাই না তাঁরা করলেন কলকাতাজুড়ে, হায়হায় রব উঠল সর্বত্র। তখন কেবল এলএসডি বেরিয়েছে, যা খেলে ঘোর অন্ধকার, এমন কি মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। সেই বিষ খাইয়ে অগ্নিপরীক্ষা দেওয়াতে সম্মত হলেন গীন্সবার্গ কেবল শক্তি ও সুনীলকে দিয়ে। আসর বসল তারাপদ রায়ের বাড়িতে। অবশ্য দু'জনেই খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন, এমন মরণ খেলা কেবল শক্তি ও সুনীলের পক্ষেই সম্ভব। সুনীলের ভাষায় 'মৃত্যু নিয়ে খেলা করাটা ছিল আমাদের একটা বিলাসিতা' [লাস্ট ওয়ার্ড, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দরবারী সাহিত্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধনা সংখ্যা ১৯৮৪]। তাই এঁরা এত স্মরণীয় কবি, স্বভাবেচরি ত্রেস ৃষ্টিতেমাতলামি তে।

বলতে গেলে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে শক্তিসুনী লের গদ্যপ দ্যের চিত্রচরি ত্র, নাট্যরীতি ও রুচি তিরিশোত্তরকে পৃথক করে ফেলে আমাদের সাহিত্যধারা থেকে। সঙ্গে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনয় মজুমদার বা তুষার রায় কিংবা এদেশে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শাহীদ কাদরী পাল্টে দেওয়া সাহিত্যপটের সহযোগী চিত্রী। এর মধ্যে শামসুর রাহমান ছাড়া সুনীলকে আমরা প্রথম চিনতে শুরম্ন করি ষাটের দশকের শেষের দিকে যখন বোদলেয়ার ইয়েভতেশেঙ্কো, ভজোনেস্কি, র‌্যাঁবো, ডিলান টমাসের কবিতার সঙ্গে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় সুনীলের কাব্য *আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি* (১৩৭২) ও *বন্দী জেগে আছো* (১৩৭৫)। তখন সবচেয়ে আগ্রহ নিয়ে পড়েছি 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ', বা 'তেত্রিশ বছর কাটলো কেউ কথা রাখেনি' (সবচেয়ে বেশি মনে পড়তো বরুণার কথা) বা 'কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মধ্যেই ইচ্ছে করে/ দুটো চারটে নিয়মকানুন ভেঙে ফেলি/ পায়ের তলে আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট/ যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি'– শেষ দু'টি লাইন যেন আমাদের জন্যই লেখা, যে পাকিস্তানীরা আমাদের পায়ের তলায় রেখেছে বহুকাল তাদের আমাদের পায়ের তলায় পিষব বলে আমরা তখন ফুঁসছি। তাই সুনীল হয়ে উঠলেন আমাদের যন্ত্রণা প্রেম ও সংগ্রামের সাথী কবি। সেই থেকে সুনীল আমাদের বোদলেয়ার, র‌্যাঁবো।

মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে, কোলাহলে, রক্তপাতে, বিজ্ঞার্ডের তাড়া খাওয়া কালে কলকাতায় থেকেও সুনীলদাকে দেখবার সুযোগ হয়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দেখার সুযোগ হল ১৯৭২ সালে সাতক্ষীরার রাজ্জাক পার্কে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সুনীল বাড়ির পাশে সাতক্ষীরা এসেছিলেন সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্ব পালনে। ভিড়ের মধ্যে সুনীলদাকে দেখে মনে হল আমাদের প্রিয় সুদর্শন কবি শামসুর রাহমানের প্রতিচ্ছবি দেখছি। ব্যস্ততা আর ভিড়ে 'চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে'র প্রিয় কবির সঙ্গে সেবার আলাপের সুযোগ হল না। সেই দিনই চলে গেলেন অন্য কোথাও। সুযোগটা এল ১৯৯০এ। আমার *স্বেচ্ছামৃত্যুর করতলে কবি* গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের জন্য কলকাতা গেলাম এবং সোজা আনন্দবাজারে। বন্ধুস্থানীয় শ্যামলকান্তি দাশ ও কমলেন্দু সরকারের মাধ্যমে পৌঁছলাম শক্তি ও সুনীলদার রম্নমে। প্রথমেই শক্তিদার টেবিলের সামনে চেয়ারে

বসে আলাপ, উদ্দেশ্য বর্ণনা, অতঃপর সুযোগ বুঝে সাতক্ষীরা সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি হিসেবে কবিকে আমন্ত্রণ জানালাম সাতক্ষীরায়। সঙ্গে সুনীলদাকেও চাইলাম। তিনি আঙুল উঁচিয়ে দূরের একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। তবে শক্তিদা যাওয়ার একটা শর্ত দিলেন, (তাঁর বন্ধু কবি আবু জাফর ওবায়দুলাহ তখন বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী) বললেন, আমি আবু জাফরকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, উনি যদি আমাদের যাবতীয় দায়িত্ব নেন তবেই যাওয়া হবে। কারণ এর আগে একবার ঢাকা গিয়ে ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার কবিকে আটকে দেয়। সেবার অনেক কাঠখড় পুড়ি য়ে তবে কলকাতা আসা। সে দুঃসহ স্মৃতি কবি ভোলেননি। তখন এরশাদকে কবি একটা খোলা চিঠি দিয়েছিলেন এ বিষয়ে যা ছাপা হয়েছিল *বিচিত্রায়*। কবি সুন্দর হাতের লেখায় ওবায়দুলাহ ভাইকে চিঠিটা লিখে আমাকে দিলেন। 'যদি ও নিশ্চয়তা দেয়...' বলে *দরবারী সাহিত্য* সংখ্যাটি সিগনেচার করে আমাকে দিয়ে বললেন, চলে যাও ওই টেবিলে দ্যাখো ওস্তাদ কি বলে। আমি ভয়ে ভয়ে সুনীলদার টেবিলে এলাম; পরিচয় দিয়ে সব বললাম। সব কিছু শান্ত ও গম্ভীরভাবে শুনে শক্তিদার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে ওস্তাদ যা করবে তাই, আমার কোন মতামত নেই। বুঝলাম কেন বলে শক্তিসুনীল অভিন্ন। তিনি *দরকারী সাহিত্য* সংখ্যাটি সিগনেচার করে আমাকে দিলেন। তার সুন্দর হাতের স্পর্শ আজও আমার শিরায় শোণিতে বহমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেশে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে ওবায়দুলাহ ভাইর মন্ত্রীত্ব চলে গেল শক্তিদার চিঠিটি তাঁর হাতে পৌঁছনোর আগেই। আর অনুষ্ঠানও ভেস্তে গেল।

তারপর শক্তিদা চলে গেলেন (২৩ মার্চ ১৯৯৫)। কবিরা দ্রুতই চলে যান। থেকে যায় কবিতা। 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব', 'সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়', 'ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি।' তারপর চলে গেলেন আমাদের প্রধান কবি, চারণ কবি শামসুর রাহমান (১৭ আগস্ট ২০০৬)। অতঃপর চলে গেলেন পাহাড়ের উচ্চতায় আসীন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২৩ অক্টোবর ২০১২)। সময়ের দিক থেকে যিনি এগিয়ে ছিলেন সর্বক্ষেত্রে– আধুনিকতায়, আচরণে, বিষয়আশয় এবং প্রগতিশীল রাজনীতিতে। তবে তাঁর সমসাময়িককালের প্রচলিত সাহিত্যের দুই ধারা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব– এর কোনটাতেই যোগ দেননি তিনি। কারণ *কৃত্তিবাসীরা* ছিলেন গোষ্ঠীনির পেক্ষ। [*বিষ্ণু দে: কৃতজ্ঞতার স্মৃতি* –সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়] এভাবেই লিখতে লিখতে কবি বড় হলেন, তাঁর মাথা ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করল– তখনই তাঁকে বার বার দেখা 'জাতীয় কবিতা পরিষদ'এর উৎসবে। শেষের দিকে দেখে তৃপ্তি মিটত না– কেমন মুটিয়ে গেছেন, স্থূল হয়েছেন, বার্ধক্যের ছাপ সর্বত্র, অনেকটা রিচার্ড বার্টনের মত। কিন্তু সেই যে ১৯৭২এ সুঠাম সু ন্দর দেহের এক বাংলা ছবির নায়ককে দেখেছিলাম সেই স্মৃতিটাই জেগে আছে মনে। এখনো তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে সেই যৌবনবন্ত রূপটিই মনে পড়ে বার বার। ২০১২র নবমীতে দশমীর বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন মনে হয়েছিল, 'যেখানে রয়েছি আজ সে কোন গ্রামও নয়, শহরও তো নয়, প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়। দুঃস্বপ্ন কেবল– [*স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ:* বিষ্ণু দে]। এমন উপলব্ধি হয় যখনই মনে হয় এ এক অকাল মৃত্যু।

এখন সুনীল মূল্যায়ন বা বিশেষণ নয়– আজ শুধু সুনীল এজন্য আমাদের কাছে স্মরণীয় যে তিনি আমাদের জীবনে কতকগুলো মিথের জন্ম দিয়ে গেছেন। এক. নীরা মিথ, দুই. দিকশূন্যপুর মিথ, তিন. কেউ কথা রাখে না মিথ, চার. অর্জুন ও কাকাবাবু মিথ, পাঁচ. শক্তিসুনীল মিথইত ্যাদি। এই নব্য মিথগুলো কনস্ট্রাকশন আকারে অতি দ্রুত গড়ে উঠছে সুনীলপাঠক দের মনে। যেমন কবি হিসেবে আমাদের মনে কিছু মিথের জন্ম দিয়ে গেছেন বোদলেয়ার, ইয়েটস, এলিয়ট বা জীবনানন্দ দাশ। এমন কবিভাগ্য দুর্লভই বটে। স্বকীয়তায়, সম্ভ্রমে, ব্যক্তিত্বে, প্রজ্ঞাদীপ্ত চৈতন্যের আলোয় অনেক মানবিক গুণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের সমাজইতিহাস ও সং স্কৃতিকে দান করে গেছেন দান্তে-চণ্ডীদাস-গ্যেটের স্বরসঙ্গতি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলা যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আরেক চারণ কবি।

সুনীল আমৃত্যু এত লিখেছেন যে সাহিত্যের এমন কোন কাগজ নেই বললেই চলে যেখানে সুনীলের লেখা ছাপা হয়নি; ফুটপাত থেকে কলেজ স্কোয়্যার, আজিজ সুপার মার্কেটের এমন কোন দোকান নেই যেখানে সুনীলের বই ঝলসে ওঠে না; এমন কোন সাহিত্য আলোচনার অনুষ্ঠান নেই যেখানে সুনীল উচ্চারিত নয়; আর যে কোন আবৃত্তির অনুষ্ঠানে সুনীলের একটি কবিতা অন্তত আবৃত্তি হবেই। তারপরও দুই বাংলার অনেকেই আছেন যারা আজো সুনীলের *সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো* বা তাঁর কবিতা পড়েননি। তাতে সুনীলের কিছু এসে যায় না, লোকসান সেই অভাজন পাঠকের। আর পড়তেই হবে এমন কোন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ সাহিত্যে চলে না। রবার্ট ফ্রস্ট রবীন্দ্রনাথ পড়েননি তাতে কি *মহাভারত* অশুদ্ধ হয়ে গেছে? তবে পড়া উচিত যেমন আমরা ফ্রস্ট পড়ি। আর সুনীল এ কারণে পড়া উচিত যে সুনীল রন্নচিশীল, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, অনর্গল। তিনি পাঠককে কষ্ট দেন না, বিব্রত করেন না, সুড়সুড়ি দেন না– তাঁর লেখা পড়ে জীবনকে জাপটে ধরে অগ্রসর হওয়া যায় শহরগ্রাম, অরণ্যপর্বত ছুঁয়ে সমুদ্রের স্বাদ গ্রহণ করে, নীলনীলিমা পেরিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় তেপান্তরের মাঠ। তাঁর সব লেখাই মনে হবে নতুন, নতুন ভুবনে পা রাখলাম, দেখলাম নতুন মানুষ, নতুন দেশ, নতুন রূপকথা। তিনি যেন এক অফুরান উৎস, 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'।

সুনীলের সব লেখা নরনারীগ ন্ধী, মদ ও মধুগন্ধী, নিঃসঙ্গতা ও আনন্দগন্ধী, ভ্রমণ ও ভালবাসাগন্ধী, সুন্দর ও শস্যগন্ধী। তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাই জীবনের ছবি, জীবনের চাবি, জীবনের সম্প্রসারিত রূপের কাহিনি। এক আশ্চর্য যাদুতে তিনি পাঠককে ভাল লাগাতে বাধ্য করতেন তাঁর লেখা পড়তে কোন কারণ ছাড়াই। এখানেই সুনীলের কৃতিত্ব, সুনীলের সফলতা। তিনি তাঁর লেখায় জীবনকে পিঠ চাপড়ে জাগিয়ে রাখতেন, মনকে রাখতেন দুঃখক ষ্টে দোলায়িত আর হৃদয় সাগরে ভাসিয়ে দিতেন একটা নৌকো, খুব টলমল, একাকী, সামনে অচেনাঅজানা এক বর্ণি ল দেশ। খুব নিবিড় ভালবাসা, প্রীতি-প্রেম, মমতাম শুলায় আরক্ত তাঁর লেখা। মানুষকে ভাসাবার, পাখিপ্রাণ হাওয়ার, স্মৃতি ও স্বপ্নপুর ণের কবি হওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর সৃষ্টি সংগীতের। কোন দর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব ছাড়াই তাঁর লেখা ছাড়া অচল ছিল সব সাহিত্যের কাগজ। তাঁর সময় তিনি ছিলেন একজন গডো– যার জন্য প্রতীক্ষা ছিল সকলের।

অনেক ঝড়ঝ ঞ্ঝা পেরিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে, নেশার মত সাহিত্যকে জীবনের অবলম্বন করে সুনীল গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বর্ণাঢ্য সাহিত্যজীবন। তাঁর লেখার মাধুর্য এখানে যে ট্রাজেডি, কষ্ট, দুঃখ, শোকস ন্তাপকে তিনি সংবেদনা দিয়ে করে তুলতে পারতেন মধুর ও ময়ূখ। তাই নির্বিবাদে বলতে পারেন 'শিল্পীর জননী নাকি দুঃখ? সর্বনাশ/ বি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আজ আমরা এজন্য বেশি করে স্মরণ করব যে, তিনি আমাদের নারীকে নতুনভাবে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের একজন বন্ধু ও সৈনিক ছিলেন, তিনি আবহমান বাঙালির অভিজ্ঞতার আধুনিকতম সংস্করণ ছিলেন, ছিলেন রবীন্দ্রনজর ুল, লালনজীবনান ন্দের সৌরকরোজ্জ্বল আলোপৃথিবী, ছিলেন বিষকে ভালবেসে অমৃতসৃজনের কবি, আর তাঁর নিরন্নদ্দেশ ধাবমান মাধুরী আমাদের জীবনকে করেছে অগ্রস্মৃতির প্রসূতি। এই সুন্দর দেশ, মানুষ, নারী, ফুলপাখিনদী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে একেবারে কবি তা চাননি, চেয়েছিলেন অমরতা, 'অমরভাবে মরা'র অমরতা– সেই অমরাবতীর একটি আসনে তোমার আসন হোক এই কামনায় 'কাল যাহা থাকিবে না, আজ যাহা স্মৃতি হয়ে আছে' সেটুকুই আমাদের সম্পদ। কবি নেই, কিন্তু সুনীলে সুনীল হয়ে আছে আমাদের আকাশ।

'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল' শ্যামরূপী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনি গ্রহণ করুন অমরাবতীর যে কোণে তিনি থাকুন না কেন। তাঁর অবর্তমানে 'মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা', অথবা 'সব মৃত্যুই অকাল মৃত্যু' মনে হয় আমাদের কাছে।

গাজী আজিজুর রহমান শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

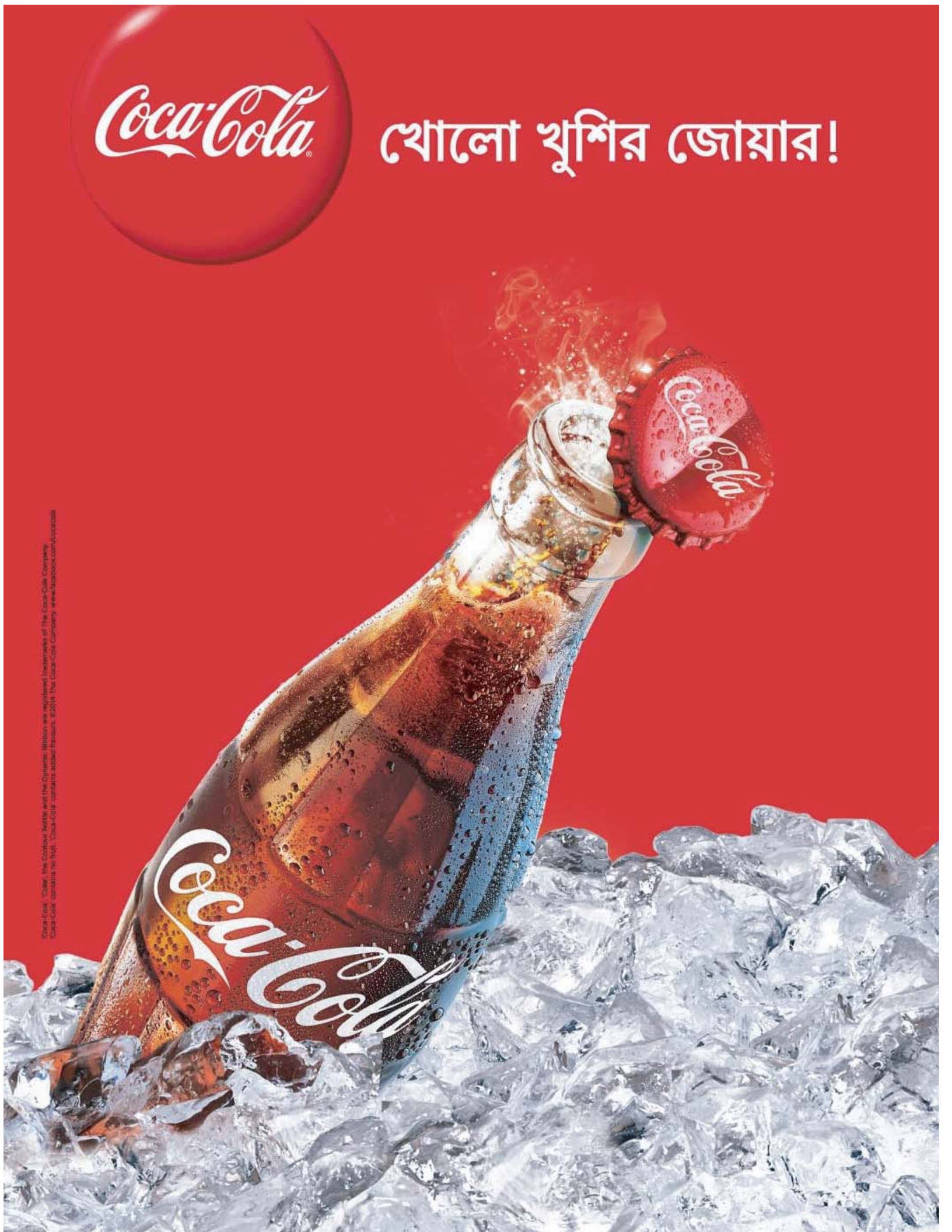
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

অনুবাদ গল্প

ঠাকুরদা ও ঠাকুমার বিয়ের গল্প

কিরণ দেশাই

বিচারকের নাতনি সাই দিনে দিনে বড় হয়ে উঠল। তার মধ্যে ভালবাসার অনুরণন ঘটতে দেখা গেল। সে ভালবাসার কথা শুনতে পছন্দ করে। সে রাঁধুনির কাছ থেকে তার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার ভালবাসার গল্প শুনতে চায়।

রাঁধুনি বিচারক আর বিচারকের স্ত্রীর গল্প বলে, 'আমি চাকরিতে ঢুকে পুরনো চাকর-বাকরদের কাছ থেকে জানতে পারি তোমার ঠাকুমার মৃত্যুর পর থেকে তোমার ঠাকুরদা অন্য মানুষ হয়ে যান। তোমার ঠাকুমা একজন দয়ালু ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি ভুলেও চাকর-বাকদেরকে গালমন্দ করতেন না। তোমার সেই ঠাকুমাকে তোমার ঠাকুরদা কী যে ভালবাসতেন, তা আর কী বলব!'

রাঁধুনির কথা শেষ হলে সাই তাকে প্রশ্ন করে, 'সত্যি সত্যি কি তারা একে-ওপরকে ভালবাসতেন ?'

'তাদের ভালবাসার কথা কেউই কিন্তু বাইরে থেকে বুঝতে পারত না।'

'তাহলে তাদের ভালবাসার কথা অন্যে জানল কেমন করে?'

'কী যে বল তুমি!'

পটেল পরিবার তাদের ছেলেকে বিলেত পাঠাবার স্বপ্ন দেখত। জেমুর বাবা যা আয় করে তা থেকে ছেলেকে বিদেশ পাঠাবার সাধ্য কোনদিনই হবে না তা পটেল পরিবার ভাল করেই জানত। চড়া সুদে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েও ছেলেকে বিদেশ পাঠানো সম্ভব নয় জেনে তারা ছেলের বিদেশ যাবার খরচের কথা মাথায় রেখে তার জন্য পাত্রী খুঁজতে থাকে। কম কথা নয়, তাদের সম্প্রদায় থেকে সে-ই প্রথম ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে। পাত্রীপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসতে দেরি হয় না। জেমুর বাবা ভাবেন, পাত্রীর রঙ যতই কালো হোক না কেন সোনার পরিমাণ বেশি লাগবে।

'সেকালে কী কেউ একালের মত ভালবাসার কথা বলে বেড়াত? তুমি আসলেই একটা অবুঝ মেয়ে! আসল ভালবাসা কি কখনো কেউ প্রকাশ করত সেকালে?'

'তুমি যা বলবে তাই আমার মেনে নিতে হবে।' তার কথা শুনে সাই বলল।

এক সময় রাঁধুনির মনে অতীত দিনের অনেক কথা ভেসে উঠল। সে সাইকে বলল, 'আসলে তোমার ঠাকুরদা তাকে ভালবাসতেন না। তাই তিনি পাগল হয়ে যান! '

'কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সবাই বলত ভদ্রমহিলা ছিল বদ্ধ পাগল।'

'ঠাকুমার নাম ছিল কী ?'

'আমি নামটা ভুলে গেছি। তবে তিনি বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। তার বাপ-দাদার সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি তোমার ঠাকুরদার পরিবারের চেয়ে বেশি ছিল। তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদার পরিবারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে হত।'

'তাহলে আমার ঠাকুরদার সঙ্গে তার বিয়ে হল কেমন করে?'

'তোমার ঠাকুরদা আইসিএস ছিলেন, তাই তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তোমার ঠাকুমার চেহারার কথা আর কী বলব! গায়ের রঙ ছিল দুধে-আলতায় মেশানো। দেহের গঠন সুঠাম। এক কথায় তিনি ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী।'

রাঁধুনির কথা যাচাই করার জন্য সাই বিচারক ঠাকুরদার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ঠাকুরদা, ঠাকুমা কি সত্যি সত্যি বড় ধনী আর অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন?'

'আমি দাবা খেলছি, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না?' বিচারক কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

বিচারক কিছু সময়ের জন্য দাবার কোট থেকে উঠে গিয়ে বাগানে হাঁটতে থাকেন। লতা-পাতার মধ্যে চড়ুই পাখিদের দলবেঁধে ওড়াউড়ি করতে দেখা যায়। তিনি ফিরে এসে আবার দাবার চাল দেন। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে পুরনো দিনের কথা তার মনে ভেসে উঠতে চায়। তিনি পুরনো দিনের কথা মনে করতে না চাইলেও তার মনে বার বার সেই সব দিনের কথা ভেসে ওঠে।

পটেল পরিবার তাদের ছেলেকে বিলেত পাঠাবার স্বপ্ন দেখত। জেমুর বাবা যা আয় করে তা থেকে ছেলেকে বিদেশ পাঠাবার সাধ্য কোনদিনই হবে না তা পটেল পরিবার ভাল করেই জানত। চড়া সুদে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েও ছেলেকে বিদেশ পাঠানো সম্ভব নয় জেনে তারা ছেলের বিদেশ যাবার খরচের কথা মাথায় রেখে তার জন্য পাত্রী খুঁজতে থাকে। কম কথা নয়, তাদের সম্প্রদায় থেকে সে-ই প্রথম ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে। পাত্রীপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসতে দেরি হয় না। জেমুর বাবা ভাবেন, পাত্রীর রঙ যতই কালো হোক না কেন সোনার পরিমাণ বেশি লাগবে। তার বাবা টাকার পরিমাণ বেশির কারণে এক ধনী মানুষের কালো মেয়ের সঙ্গে জেমুর বিয়ের পাকা কথা দেবার উপক্রম প্রায় করেই ফেলেছিলেন আর কী!

বিচারক এ পর্যন্ত ভেবে আবার দাবা খেলায় মন দেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে ভেসে ওঠে তার বিয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলোর কথা। সে সময় পিলপিথ শহরের সামরিক ছাউনির ধারে বোমানভাই পটেল নামে এক ব্যবসায়ী সপরিবারে বসবাস করতেন। ব্রিটিশ আর গাইকোয়াডদের একটা খণ্ডযুদ্ধের সময় বোমানভাই পটেলের বাবা ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করায় তাকে রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পিলপিথের ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘোড়ার খাবার সরবরাহের কন্ট্রাক্টরিও দেওয়া হয় তাকে। এক সময় এই পরিবার সৈন্যদের শুকনো খাবার সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এক সময় বোমানভাই বাবার ব্যবসায়ে হাতে নেন। তিনি বিকল্প পথে আরো অর্থ উপার্জনের রাস্তা পেয়ে যান। পরিচয়হীন বেওয়ারিশ মেয়েদের শহরের এক নিষিদ্ধ এলাকায় সৈন্যদের হাতে তুলে দেবার কারবার করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হন।

তিনি তার পরিবারবর্গকে তার কারবারের কলুষতার বাইরে রাখতে সক্ষম হন। বোমানভাইয়ের স্ত্রী-কন্যারা হাভেলির দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত বাড়িতে থাকতেন। তার বাড়ির বাইরে লেখা ছিল 'বোমানভাই পটেল নিবাস, মিলিটারি কন্ট্রাক্টর, মানিলেন্ডার ও বিজনেসম্যান'। হাভেলির অন্দরমহলে আভিজাত্য, পর্দানশীনতা আর জাঁকজমক পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সিল্কের কাপড়চোপড় বিক্রি করতে আসা চিনারা অন্দরের বিবিসাহেবাদের দেখানোর জন্য তাদের দ্রব্যসামগ্রী ভিতরে পাঠিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষায় থাকত। এক সময় বোমনভাই দুর্লভ স্বর্ণালঙ্কার আর দেউলিয়া হওয়া রাজপ্রাসাদের দামী আসবাবপত্র কিনে স্ত্রী- কন্যা এবং অন্দরমহলকে সুসজ্জিত করেন।

একদিন কয়েকজন লোক বোমানভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে জেমুর আসন্ন ইংল্যান্ডযাত্রা সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। ইংল্যান্ডযাত্রার রসদ সংগ্রহের জন্য তাকে কোন ধনী পিতার কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবার খবরটা জানাতে তারা ভোলে না। বোমানভাইয়ের মনে উচ্চাশা জাগে। তারপর থেকে তিনি এমন একটা পাত্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন ।

তিনি দু'ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে জেমুদের বাড়ির

বোমানভাইয়ের স্ত্রী-কন্যারা হাভেলির দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত বাড়িতে থাকতেন। তার বাড়ির বাইরে লেখা ছিল 'বোমানভাই পটেল নিবাস, মিলিটারি কন্ট্রাক্টর, মানিলেন্ডার ও বিজনেসম্যান'। হাভেলির অন্দরমহলে আভিজাত্য, পর্দানশীনতা আর জাঁকজমক পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সিল্কের কাপড়চোপড় বিক্রি করতে আসা চিনারা অন্দরের বিবিসাহেবাদের দেখানোর জন্য তাদের দ্রব্যসামগ্রী ভিতরে পাঠিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষায় থাকত।

বোমানভাইয়ের বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ে এক সপ্তাহ ধরে চলে। বোমানভাই অভ্যাগতদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখেননি। তিনি মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়িয়ে দেন। তিনি যৌতুক হিসেবে জামাইকে নগদ অর্থকড়ি, সোনাদানা, ভেনিজুয়েলার পান্না, বার্মার রুবি, হীরের অলংকার, সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি, ইংল্যান্ডের উপযোগী স্যুটের কাপড় দেন; সেইসঙ্গে বোম্বাই থেকে লিভারপুল যাবার জাহাজের টিকেট।

দরজায় হাজির হন। জেমুর বাবার কাছে তার মেয়ে বেলার বিয়ের প্রস্তাব রাখেন। সুন্দরী বেলা তার বাবার প্রাসাদে রাজকন্যার মত জীবন কাটিয়ে আসছে। বোমানভাই ভাবেন, জেমু যদি বিলেত থেকে বিদ্যা লাভ করে এসে সফলতা অর্জন করতে পারে তবে তার মেয়ে হিন্দুস্থানের অন্যতম ক্ষমতাধর মানুষের স্ত্রী হবে ।

বোমানভাইয়ের বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ে এক সপ্তাহ ধরে চলে। বোমানভাই অভ্যাগতদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখেননি। তিনি মেয়েকে জড়োয়ায় মুড়িয়ে দেন। তিনি যৌতুক হিসেবে জামাইকে নগদ অর্থকড়ি, সোনাদানা, ভেনিজুয়েলার পান্না, বার্মার রুবি, হীরের অলংকার, সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি, ইংল্যান্ডের উপযোগী স্যুটের কাপড় দেন; সেইসঙ্গে বোম্বাই থেকে লিভারপুল যাবার জাহাজের টিকেট।

জেমুভাই-পরিবার নতুনবউয়ের নামকরণ করেন তাদের পছন্দমত। শ্বশুরবাড়িতে আসার কয়েক ঘণ্টা পরে বেলা নামটি নিম্মি নামের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ইংল্যান্ড যাবার টিকেট আর এ্যালকোহলের প্রভাবে জেমুভাইয়ের সাহস বেড়ে যায়। অল্পবয়সী চাচারা তাকে যেমন বলে দিয়েছিল সেভাবে জেমুভাই বিছানার এক কোণে বসা সোনার গয়নায় মোড়া নতুনবউয়ের ঘোমটা খোলার চেষ্টা করে। চোদ্দবছরের বাচ্চা মেয়েটি আতঙ্কে কেঁদে ফেলে বলে, 'আমাকে বাঁচাও।' বউয়ের আতঙ্কিত চেহারা দেখে জেমুভাইও আতঙ্কিত হয়ে তাকে বলে ওঠে, 'কেঁদো না তুমি, আমি তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি না আর।' মেয়েটি কেঁদেই চলে।

জেমুভাইয়ের ভীরুতার জন্য অল্পবয়সী চাচারা পরদিন সকালে তার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করে। দ্বিতীয় রাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় জেমুভাই অল্পবয়সী চাচাদের কাছে আবারও হাস্যাস্পদ হয়। তারা জেমুভাইকে মিনতি করে বলে, 'জোর খাটাও, তাকে বেয়াড়া হতে দিও না।'

নতুনবউয়ের ব্যবহারের খবর শুনে অনেকেই অখুশি হয়। তারা বলে, 'নতুনবউ এমন আচরণ করলে আমাদের জেমু যে দু'দিন পরে ইংল্যান্ড যাবে সে কীভাবে সুখী হবে?' তার নিজের এবং বউয়ের জন্য জেমুভাই মনে মনে কষ্ট পায়। পরস্পরের সাথে মিলিত না হতে পারায় তারা উভয়েই মর্মবেদনায় ভোগে ।

বিলেত যাবার খরচবাবদ জেমুভাইয়ের পরিবার যখন অলঙ্কার বিক্রি করতে ব্যস্ত, তখন বাবার হারকিউলিস সাইকেলে চেপে জেমুভাই ঘুরতে যাবার জন্য বউকে আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমে তার বউ আগ্রহ না দেখালেও এক সময় সে কান্না ভুলে জেমুর সাইকেলের পেছনে চেপে বসে। তার জয় নিশ্চিত জেনে জেমুভাই সাইকেলে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে বউকে বলে, 'তোমার পা-দুটো বাইরে রাখ।' সে ধীরে ধীরে সাইকেলের গতি বাড়ায়। সে গাছপালা আর গরুবাছুরের ভিতর দিয়ে বউকে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে সামনের দিকে ছোটে। জেমুভাই তার সাইকেলের পেছনের সিটের দিকে তাকিয়ে তার বউয়ের চোখে চোখ রাখে। জেমুভাইয়ের মনে হয় আগে কখনো নতুনবউ তার দিকে এমন করে তাকায়নি। সে দ্রুত প্যাডেল করতে থাকে। সে যেন বউকে সাইকেলের পেছনের সিটে বসিয়ে উড়ে চলে। তাদের দু'জনের মন সবুজ প্রান্তর ছাড়িয়ে নীল আকাশে ভাসতে থাকে।

বিচারকের চিন্তায় ছেদ পড়ে। তিনি দাবার দান দিয়ে মুখ তুলে দেখতে পান সাই একটা গাছ বেয়ে উপরে উঠছে। বিচারক গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ান।

অনুবাদ মনোজিৎকুমার দাস

লেখক পরিচিতি:

প্রবাসী ভারতীয় লেখক কিরণ দেশাইয়ের জন্ম চীগড়ে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। তিনি অ্যাংলো-ইংলিশ ভারতীয় ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *হুল্লাবাল্লো ইন দি গুয়েভা অর্চারড* প্রকাশিত হয়। নেশন অফ কমনওয়েলথ লেখক হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সোসাইটি অফ অথর-এর ট্রাস্ক অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২০০৬ সালে তাঁর লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস *ইনহেরিটেন্স অফ লস*-এর জন্য 'দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ' লাভ করেন। তাছাড়াও এ উপন্যাসের জন্য তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। এ উপন্যাসের জন্য তিনি 'ন্যাশনাল বুক ক্রিটিকস ফিকশন অ্যাওয়ার্ড'ও লাভ করেন। আমেরিকাপ্রবাসী প্রখ্যাত লেখক অনিতা দেশাই তাঁর মা। ইংরেজি ভাষায় লেখা *ইনহেরিটেন্স অফ লস* উপন্যাসের বিচারকের নাতনি সাই-এর ঠাকুরদা ও ঠাকুমার বিয়ের গল্পের অধ্যায়টি এখানে মুদ্রিত হল। এখানে সাইয়ের বিচারক ঠাকুরদা তাঁর বিয়ের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

ফাল্গুনের দিন খুব বড় নয়। তাই হুট করে বিকেল হয়। তবু একফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল কাজল– কিরে রীনু বিনু চালতামাখা খাবি?

এখন?

খেতে চাইলে আমি মেখে আনতে পারি।

এখন থাক। জানায় রীনু। এখন ওর চালতামাখা খাবার ইচ্ছে নেই।

ছাদে সকলের শাড়ি কাপড় উড়ছে পত পত করে। হাত দিয়ে দেখে কোনটি ভেজা আর কোনটি শুকনো। শাড়িগুলো শুকনো। পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি ভেজা ভেজা। ও বাড়ির ছাদে পবিত্রর ভাই পরিমল ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। কাজল বলে– সময় পেলে আমরাও একদিন মাঠে যাব ঘুড়ি ওড়াতে। তার আগে ঘুড়ি, সুতো আর মাঞ্জার ব্যবস্থা করতে হবে।

তুমি পারো ঘুড়ি ওড়াতে?

এত বড় বড় চোখ করে 'তুমি পারো' করতে হবে না। আমি পারি। আমার মত অনেকেই পারে।

আমরা পারি না। বলে বিনু।

কারণ তোমাদের মা এসব করতে দেন না তাই।

আর তা ছাড়া আমাদের ওখানে বড় মাঠ নেই। একটা একটু দূরে আছে সেখানে ছেলেরা কেবল ফুটবল খেলে।

সেটাই কারণ। বলে কাজল।

ছাদ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা। রীনু বিনু এবার মিঠুপার তত্ত্বাবধানে। বৈকালিক সাজ-সজ্জার কারণে। কাজল এসে বুবুর পেটের কাছে বসে। চুমকি তখনো ঘুমিয়ে। বুবু চিরকাল বই পড়তে ভালবাসেন। কি এক বই পড়ে চোখ বুজেছেন। কাজলকে দেখে চোখ খোলেন। কাজের মেয়েটিকে কাজল বলে ছাদে গিয়ে কাপড়গুলো তুলে ফেলতে। মেয়েটি বুবুর চুলে বিলি কাটছিল। বুবু বলেন– কি খবর কাজলী রীনু বিনু কোথায়?

এখন মিঠুপার তত্ত্বাবধানে। অংক কষছে না বিকালের সাজগোজ হচ্ছে বলতে পারব না।

তোর পড়াশুনা, অন্যসব খবর বল।

আমার বিশেষ কোন খবর নেই। বুবুর হাতের সোনার চুরি ড়্যায়ে ড়্যায়ে পালিশ উঠিয়ে ফেলেছে। এগুলো সবসময় ওর হাতে থাকে। কাজল চুড়িগুলো ওঠাতে ওঠাতে আর নামাতে নামাতে বলে– রীনু বিনু চুমকির পর তোমার একটি ছেলে হলে ভাল হয়। ওদের একটি ভাই হবে। ভাই থাকা ভাল। আমার যদি পবিত্রর মত একটি ভাই থাকত খুব ভাল হত।

বুবু কাজলকে দেখে– আমারো তো তাই ইচ্ছে। কিন্তু কি হবে আগে থেকে কে বলতে পারে।

আমি জানি ওদের ভাই হবে। মা বলেছে আমাদের তিনবোনের পর একটি ভাই হয়েছিল। বেচারা ভাইটা মারা গেছে। সেই কারণেই বলছি। কাজল এমন করে বলছে যেন বুবু এর কিছুই জানে না। বুবু হাসেন। বুবুর হাসি মিঠুপার মত দুর্লভ নয়। বুবু যখন তখন হাসে। বুবু কাজ করতে করতে গুনগুন করে। বুবু বই পড়ে। আর মাঝে মাঝে কাগজে ছড়া বানায় মেয়েদের জন্য। বুবু কাজলের হাত তুলে নেন নিজের হাতে। আবার হেসে বলেন– জানিস কাজল তোর দুলাভাই বলেছে এবারে ছেলে হলে নতুন বেনারসি আর কানপাশা। বলতো এতোসব পুরস্কার আমার ভাগ্যে আছে কিনা।

নিশ্চয়ই আছে। আর আমরা কি পাব?

বুবু একটু হেসে বলে– তোর একটি নতুন জামা আর মিঠুর একটি শাড়ি। ঠিক আছে?

এত খরচাপাতি করতে পারবেন আমাদের পোস্টমাস্টার সাহেব?

ওর একটি গোপন জমার বই আছে। সেখান থেকে করে ফেলবে সব। ও খুব জমাতে ভালবাসে। তবে সেগুলো আমাদেরই কাজে লাগে। বুবু উঠে চুলগুলোকে গুছিয়ে খোঁপা করতে করতে বলেন।

আমার নীল বা নিলয় নাম খুব পছন্দ। না হলে পিয়াল।

আমারও। বুবু বলেন।

আমি জানি মিঠুপা বাধ সাধবে। বের করবে কোন কঠিন নাম চলন্তিকা দেখে।

বুবু কাজলের চুল নেড়ে বলেন– চল তোর চুল বেঁধে দেই। সারাদুপুরের রোদ গেছে চুলের উপর দিয়ে মনে হয় তাই এমন চেহারা। বুবুকে দেখে আব্বা বলেন 'ভারতবর্ষের কমু-লসর্বস্ব ঋষিদের মত আনন্দিত আমার রেবা।' সারাক্ষণই আনন্দে থাকে। ওর চরিত্রের এই বিশেষ গুণটি আমার কাছ থেকে পাওয়া। কথা একেবারেই সত্যি। সদানন্দ বাবার আনন্দময়ী মেয়ে।

বুবু আশাপূর্ণার গল্পসমগ্র পড়ছিলেন। কাজল বলে– আমার কাছে শিবরাম চক্রবর্তী সমগ্র আছে। পড়বে? শিবরামের নাম শুনেই বুবু হেসে ওঠেন। ডালুমাসি আর বিনি। এই বলেই আবার হাসেন।– ওর সেই মজার গল্পটা বেশ। বেড়ালটাকে ফেলতে গিয়েছিল যে মানুষ সে আবার পথ হারিয়ে ফেলতে যাওয়া বেড়ালের পিছে পিছে বাড়ি এসেছিল। কাজলও হো হো করে হেসে ওঠে– তোমার মনে আছে চচ্চড়ির ইংরাজি? বুবু বলেন– খুব, স্ন্যাপরাইড। স্ন্যাপ মানে চড় আর রাইড মানে চড়ি। আই রাইড এ হর্স। তোর দুলাভাই প্রায়ই বলে– কিগো আজ কিসের স্ন্যাপরাইড হচ্ছে?

দুলাভাই মজার।

মাঝে মাঝে জ্বলন্ত ভিসুবিয়াস। রীনু বিনুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবি।

তা হলেও বেশ।

বুবু ওর জামার উপরে পড়ে থাকা মালাটার লকেট সিধে করতে করতে বলেন– বাবাদের একটু রাগ থাকতে হয়। যা দিনকাল।

তোমার তো আর বাবা নয়। যখন রাগ করে তোমার সঙ্গে তখন কি কর?

কি করব। একসময় নিজেই ভাব করে ফেলে। কথা না বলে বেশিক্ষণ নিজেই থাকতে পারে না। ওরই অসুবিধা।

আব্বার কবিতাগুলো ছাপালে বেশ হবে।

হবে হয়তো ছাপানো। লিখতে পয়সা লাগে না, ছাপাতে লাগে। সেটার ব্যবস্থা হলেই হবে।

বাইরে রীনু বিনুদের খলবল কণ্ঠ। বারান্দায় বসে গেছে সব দুধ-মুড়ি খেতে কাকাতুয়ার মত ঝুঁটি বেঁধে। চুমকি বড় বড় চোখে ঘুম থেকে জেগে উঠে সকলকে দেখছে। কোন্ কারণ নিয়ে ভ্যাঁ করা যায় তাই বোধকরি ভাবছে। কাজল চুমকিকে কোলে তুলে বারান্দায় আসে।

বিকেলের নিরিবিলি অন্যরকম। চা-মুড়ি খাওয়া, পাউডার মাখা, চুলবাঁধা। এই সব। আর বিকেলের পরমায়ু বড় ছোট। তারপরই নামে সন্ধ্যা। নামাজ, পড়তে বসা। কখনো রেডিও শোনা। তবে সেটা সবসময় নয়। মিঠুপা বলেন– ফিতে নিয়ে আয় চুল বাঁধতে হবে না।

শাহেদ কাল সকালের ট্রেনে চলে যাবে। তার আগে সে খবর নিয়ে এসেছে কলেজের কাছে বড় মাঠে মেলা বসেছে। সাজগোজের রীনু বিনুকে নিয়ে সে মেলায় যাবে। আর সেখানে মাকড়সাকন্যা আর খাজা-গজা কিনে বাড়ি ফিরবে। কাজল বলে– আমিও যাব।

মা-মিঠুপা সমস্বরে বলে– না। তোকে যেতে হবে না।

শুধু করুণাময়ী বুবু বলেন– আহা যাক না।

বুবুকে মেনে সকলে রাজি হয়। কাজল মেলায় যাবার অনুমতি পায়। মা বলেন– সাবধানে যাবি। হারাস না যেন।

কাজল বিরক্ত হয়– রীনু বিনু হারাবে না আর আমি হারিয়ে যাব?

ওর মনে পড়ে অনেক আগে ও একবার হারিয়ে গিয়েছিল। সেই পাগলচাচার আর কোন খবর জানে না ওরা।

সেটাই তো সমস্যা। মিঠুপা বলে– ওরা হয়তো নাও হারাতে পারে কিন্তু তুমি ডেফিনিটলি হারাবে।

এ্যান্ড ডেফিনিটলি পরীক্ষার পর তোমাকে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করা হবে। কাজল রেগে বলে।

কি হচ্ছে এসব। বুবু এগিয়ে আসেন।

আমার ব্যাপারে মিঠুপার ধারণা খুব খারাপ।

ওর ধারণা আমি ভয়াবহভাবে সাবধানী। সেটাই ওর পছন্দ নয়। এবারে যাও। মিঠুপা কাজলের দিকে তাকিয়ে বলে।

সকলে টাকাপয়সা পেল মেলাতে খরচ করবার জন্য। বুবু চুপ করে আরো আটআনা দিলেন এই বলে– সাবধান কাজল। হারাস না যেন।

বুবুর কথায় না হেসে পারে না কাজল। বলে– হারাব না।

চুমকিকে মিঠুপা কোলে তুলে ছাদে চলে গেল। এদের সমবেত মেলাযাত্রার পর চুমকি যে কাঁদবে না তাতো হতে পারে না।

চোদ্দ.

খাতা খুলে সবে একখানি মনোরম কবিতার মকশো করছে পান্না। ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢোকে আব্বাজান আসমাতউলাহ্। পান্না লিখছে– হে আমার কবিতা পাখা/ খান খান কর সমস্ত দেয়াল/ আমি কোন দেয়ালকেই আর মানব না/ আমি নীলপদ্ম তুলে ও বাড়ির নিঃশব্দ মেয়েটিকে... আব্বাজানের দাড়িতে মেহেদি। চুলে কলপ। তার উপরে গোলটুপি। পাঞ্জাবির নিচে যে পাজামা তা ধূলি ও পায়ের গিঠ থেকে অনেক দূরে। পান্না খুব তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা চাপা দেয় মোটা ইতিহাসের বইয়ের নিচে। সৌম্যশান্ত পায়ে আব্বাজান ঘরে এসেছেন। বারোটার আগে তাকে কেউ দেখে না। আজ তিনি রাত নয়টায় ছেলের ঘরে। ব্যাপার নিশ্চয়ই গূঢ়তর ভাবে পান্না। দাড়ি শাদা-কালো। সেখানে মেহেদির রং। তিনি কি কারণে এ ঘরে নাজেল হলেন বুঝতে পারে না পানাউলাহ্।

পরীক্ষা কবে?

দু'মাস পরে। বিনীত উত্তর।

পড়াশুনা কেমন হচ্ছে বা পরীক্ষা কেমন হবে সে প্রশ্নের ধারে কাছে গেলেন না। কোন প্রকার ভণিতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলেন– ব্যবসাপত্তর বুঝবা কবে?

বুঝি তো কিছু কিছু। তেমনি বিনীত উত্তর পান্নার।

ওইটুকু বোঝাবুঝিতে কিছু হবে না পানাউলাহ্। পাপিয়ার জন্মের বারো বছর পর তোমার জন্ম আজমিরী বাবার মর্তবায়। আমার এত কষ্টের ব্যবসাপত্তর অন্যের পোলা এসে দখল করবে এই ভীতির কথা আজমিরীবাবাকে বলেছিলাম। তার সুতোপড়ায় কাজ হয়েছে।

অন্যের পোলা তো সিভিল সার্জন। তিনি কেন আসবেন এসব দেখাশোনা করতে।

বিশ হাজার টাকা দিয়ে সিভিল সার্জন কিনেছি। টাকার লোভ তার যে কত তখনই বুঝেছি। তিনি কেন আসবেন? টাকার লোভে। এই বলে হাজি আসমাতউলাহ্ দাড়িতে হাত বোলান।

তুমি না জন্মালে পাপিয়ার লোভী স্বামী না হলে পারন্নলের দুলা এগুলো ভোগ করত।

পারুলের দুলা কোথায়?

হতে কতক্ষণ। আর দু'এক বছর। তারপর বিশের জায়গায় চলিশ হাজার দিয়ে আর একজনকে কিনে আনব। আব্বাজানের কথা শুনে মনে হয় তিনি হাট থেকে কোরবানির গরু কেনার কথা ভাবছেন। হাজি আসমাতউলাহ্ একটু হাঁটেন। পায়চারি যাকে বলে। পান্না ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত। কি যে বলেন এরপর সেই ভেবে।

আর কত পড়াশুনা করবা? যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শেখোনি এতদিনে? ওইটুকু শিখলে তোমার জীবন খারাপ যাবার কথা নয়। আমার গুলা নাড়াচাড়া করে খাবা। পান্না একটু ভেবে শান্ত গম্ভীর গলায় বলে– বিএ পাশ শেষ করে আমি ব্যবসাপত্রে হাত লাগাতে চাই।

পান্নাউলাহ্ সময় বেশি নষ্ট কোরো না। ক্লাশ ফোর পাশ আমি যদি লাখ লাখ টাকা বানাতে পারি তুমি এতগুলো পাশ দিয়ে সেগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখেশুনে রাখতে পারবে না?

বিএ পাশ আমাকে করতেই হবে। পান্না আবার বলে।

তার মানে আরো তিন বছর তুমি গায়ে বাতাস লাগায়ে ঘুরতে চাও? আরো তিন বছর ঘুরবা? ঘোরো। আমি তো এখনো জিন্দা।

পড়াশুনা করব। কঠিন কঠিন অংক শিখব। আপনার ভাষায় বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ। কলেজের মাঠে স্টাফ কোয়ার্টার। বাতাস নাই। এ ছাড়াও ছাত্রদের হোস্টেল।

বেয়াদবের মত তর্ক করবা না। বাতাস লাগানোর মানে তুমি ভালই জানো। বাপের হোটেলে খাব আর রাজা-উজির মারব।

এই বলে ঘর থেকে বের হবেন বলে দরজার দিকে যান হাজি আসমাতউলাহ্। সুতনুকা খাতা আবার বের করতে যাবে ভাবছে, বাবা ঘরে ঢোকেন। এবং এবারও ভণিতা বাদ দিয়ে বলেন– শোন এ বাড়ির নাম আমি বদলাতে চাই। ওই মালাওন নাম 'নির্ঝর' আমার পছন্দের নয়।

পছন্দ নয়। আর্তনাদ করে ওঠে পান্না।

না আমি নাম রাখতে চাই 'আছিয়া মঞ্জিল'– তোমার দাদির নামে।

পান্না প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। বলে– এ বাড়ির অন্য নাম? ভাবাই যায় না। অন্য নাম বদলে দেবে বাড়ির চরিত্র।

এই চরিত্রহীন নামই বদলানো দরকার। অনেক কষ্টের পর পাকিস্ত্মান পাইছি। তারপরেও মালাওন নাম। তোমার মতামত নিতে আসিনি। তোমারে জানায়ে গেলাম। 'আছিয়া মঞ্জিল' না হলে 'আনোয়ারা ম্যানসন'– তোমার মায়ের নামে। এই বলে তিনি চলে যান।

পান্না নিস্তব্ধ। সর সর মর মর বীথিকার বাড়ি! এর চেয়ে ভাল আর কোন নাম হতেই পারে না। বোগেনভেলিয়া মাধবীলতায় কি অপরূপ এই 'নির্ঝর'। লতানো গোলাপে ছেয়ে থাকে একপাশের দেয়াল। 'নির্ঝর' নাম বদলে যাবে? কারণ বাবার মতে নামটি মালাওন? হতেই পারে না।

পান্না খোঁজ করে মায়ের। মার প্রভাব সামান্য নয়। ঘোরতর মুসলমান হাজি আসমাতউলাহ্ও স্বীকার করেন সংসারে লক্ষ্মী নামে যে দেবীর কারণে সবকিছু ফুলে ফেঁপে ওঠে সে লক্ষ্মী মা। তাকে তিনি কেবল জুতো খোলা ও জুতো মোছার কারণে ভালবাসেন না। আর ভাল যে বাসেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পান্না একটু ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। মমতা ও পারুল ব্যাডমিন্টন খেলছে। হয়তো অল্পকিছুদিন পরে

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুকুর, বাগানবিলাস, গুলমোহর, ঘাস, দূর্বা, লতানো গোলাপ দেখে পান্না। মনে মনে অসমাপ্ত কবিতা শেষ করতে চায়। বলে আপনমনে– এই দিন স্বপ্নের/ আশাতরু বপনের/ এইদিন ফাগুনের/ রূপকথা চয়নের/ ছাদ ফুঁড়ে নিমেষে/ মাথা ঠেকে আকাশে/ এই দিনে মিঠুয়া/ তুমি খালি আলেয়া। এমনি সব ঠাসবুনুনির লাইন মনে মনে চয়ন করে ও মায়ের ঘরে আসে। মা জায়নামাজ গুটিয়ে গালে একটি পান ভরেছেন। খাটে বসে বিষাদসিন্ধু খুলে বসেছেন। পান্নাকে দেখে বলেন পান মুখে– কি রে গান্দা খোঁজ করতাছিলা ক্যান? পান্না প্রথমে মায়ের খুব কাছে বসে। তার হাঙরমুখো বালাপরা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে – মা মরে যাব এ বাড়ির নাম বদলালে।

পারুলের জন্য এ পর্ব নিষিদ্ধ হবে। যখন আব্বাজান চলিশ হাজার টাকার জাল ফেলে পারুলকে তুলে দেবেন কোন এক ডাক্তার না হলে সিএসপির হাতে না হলে কোন এক টাকাওয়ালা দোকানদার। ব্যালকনি থেকে পান্না ওদের ওয়েভ করে– আজ কাজল আসেনি। সাদা কর্ক আর ব্যাট হাতে?

আজ কাজল ব্যস্ত রেবাদির কারণে। মমতা জানায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুকুর, বাগানবিলাস, গুলমোহর, ঘাস, দূর্বা, লতানো গোলাপ দেখে পান্না। মনে মনে অসমাপ্ত কবিতা শেষ করতে চায়। বলে আপনমনে– এই দিন স্বপ্নের/ আশাতরু বপনের/ এইদিন ফাগুনের/ রূপকথা চয়নের/ ছাদ ফুঁড়ে নিমেষে/ মাথা ঠেকে আকাশে/ এই দিনে মিঠুয়া/ তুমি খালি আলেয়া। এমনি সব ঠাসবুনুনির লাইন মনে মনে চয়ন করে ও মায়ের ঘরে আসে। মা জায়নামাজ গুটিয়ে গালে একটি পান ভরেছেন। খাটে বসে *বিষাদসিন্ধু* খুলে বসেছেন। পান্নাকে দেখে বলেন পান মুখে– কি রে গান্দা খোঁজ করতাছিলা ক্যান? পান্না প্রথমে মায়ের খুব কাছে বসে। তার হাঙরমুখো বালাপরা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে – মা মরে যাব এ বাড়ির নাম বদলালে।

মা ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে চান। তিনি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আব্বাজানের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত তিনি জানেন না। মা সেইকালে মোহসীন স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। পড়াশুনা হয়নি। কিন্তু মায়েরও আছে একটি *সঞ্চয়িতা*। *বিষাদসিন্ধুর* সঙ্গে। শরৎচন্দ্রও পড়েন সময় পেলে। 'নির্ঝর' নামের সোনার ফলক তার চেষ্টায় সমূহপতন থেকে রক্ষা পাবে কি?

পনেরো.

কাজলের লাল ফুলফুল জামা। কোমরের পেছনে বেল্টের শাসন। যে শাসন এখন ফুলের স্তবক। ওড়না পেঁয়াজের খোসার মত পাতলা। দরকার হলে গলা থেকে নামিয়ে ব্যাগে রাখা যায়। যে কাজলের হাঁটুভর্তি ধুলোবালি, খোঁচা-লাগা ছেঁড়া জামা– এখন ও সাবান লাগানো ক্রিমঘসা সুশ্রী মেয়ে। পাউডার গলার কাছে। কপালে টিপ। খুশির আভায় ঝিকমিক। রীনু বিনুকে নিয়ে শাহেদের সঙ্গে রিকশায় ওঠে।

শাহেদ চুপ করে আছে। খুব বেশি কথা বলতে কাজল তাকে দেখেনি।

ওরা রিকশায় ওঠে। কাজলের কোলে রীনু আর শাহেদের কোলে বিনু। সেই দেওদার পথ আসতেই এক লাইন গান গেয়ে চুপ করে কাজল। যে পাশে বসে আছে নিঃশব্দে তারই কারণে ঠিক নয়। খুশি হলে কাজলের গলায় গান চলে আসে– ও কোন সুরে উতলা মন আমার।

মেলার মাঠ আনন্দের মাঠ। ওরা মাঠে নেমেই টিকিট কেটে নাগরদোলায় চেপে বসে। নাগরদোলার উপর থেকে দেখে শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তিনজন ভেংচি কাটে। শাহেদ ঠিক তেমনি।

তোর চাচাটা অমন কেন? বলে কাজল।

চাচা আমাদের অংক করায়। আর মাঝে মাঝে আব্বার সঙ্গে রাজনীতির কথা বলে।

রাজনীতি কিরে রীনু? প্রশ্ন করে কাজল।

রাজনীতি মানে দেশের নেতাদের গল্প। ভাল নেতা খারাপ নেতা। এইসব। তুমি জানো না রাজনীতি কি?

মনে হয় না। বলে কাজল।

আসলে চাচুর মাথায় অনেক উকুন। কামড়ে চুপ করে আছে। বলেই বিনু হাসে।

উকুনের সাবান দিয়ে মাথা ঘসলেই সব উকুন নির্বংশ হবে। না হলে সব চুল কেটে ফেললেই উকুন নিজের বাড়ি চলে যাবে।

নিচে নামতেই ওরা আর একবার বুঝতে পারে এই পৃথিবী ক্রমাগত ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কাজল লক্ষ্য করে দূরে দাঁড়িয়ে পান্নাভাই হাসছে। কাছে এসে কাজলের হাত ধরে বলে– মেলায় আসবি আগে বলিসনি কেন?

তারপর বিনুকে কোলে তুলে নেয়।

জানতাম না আসব। হঠাৎ ঠিক হল। কাজল বলে।

ওদিকে চল। মাকড়সাকন্যা ব্যাঙরাজপুত্র ওদিকে। পথ চলতে চলতে পান্না বলে– সঙ্গের এই বিশেষ ভদ্রলোকটি কে রে? মনে হচ্ছে খানিকপরেই জাতিসংঘের কোন গূঢ়তর সভায় যোগ দেবেন উনি।

ওই বিশেষ ভদ্রলোক শাহেদ মাহমুদ। রীনু-বিনুর চাচা।

সমস্যা কি? এমন চুপচাপ কেন?

ব্যক্তিত্ব। কাজল বলে। আমাদের সঙ্গে কথা বললেই যা পাংচার।

হাতির ডিম। ব্যক্তিত্ব পাহারা দেবে তোদেরকে হাতের কাছে পেয়েও। এসব পাহারায় ব্যক্তিত্ব একদিন পালাতে পথ পাবে না। বলবে– আমি গেলাম। তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে তুমি থাক। কাজল ব্যক্তিত্ব মানে কি?

ব্যক্তিত্ব মানে মিঠুপা। বলেই কাজল হাসে।

তুই না মাঝে মাঝে বড় সাংঘাতিক সব কথা বলিস।

মাকড়সাকন্যার দিকে বড় বড় করে তাকায় সকলে– ওমা ওর পা কোথায় পান্নামামা?

পা থাকলে ও বিনু হয়ে যেত। পা নাই তাই মাকড়সাকন্যা।

নকুলদানা, চটপটি, গরম সিঙ্গাড়া খেয়ে আরো কিছু বাড়ির জন্য কিনে নিল কাজল। পান্নার পাঞ্জাবির পকেট সবসময়ই উদার। পান্না একটি প্যাকেট মিঠুর হাতে দিয়ে বলে– এই ঠোঙা তোদের ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মিঠুপার জন্য। আমি জানি এই খাবার উনি ভালবাসেন।

আপনার নাম করে দেব?

নো প্রয়োজন। পান্না বলে। যদি জানি খেয়েছেন জীবন সার্থক মনে করব।

কাজল হাসে। লক্ষ্য করে একটু তেরছা করে ওদের হাসাহাসি দেখছে শাহেদ। সন্ধ্যা যখন বেশ একটু রাত রাত ওদের মেলা ছাড়তে হয়। পান্না আগেই চলে গেছে। বোধহয় বাবার তেলকল ঘুরে যাবে। না হলে 'পাপিয়া আটা মিল' বা 'আনোয়ারা তেলের মিলে' চেহারা দেখিয়ে আসবে। 'নির্ঝর' নাম বাঁচাতে এসব করতে হবে তাকে। শুধুমাত্র মায়ের ভেটো নয় তার সঙ্গে আলহাজ আসমাতউলাহর বেঁধে দেওয়া শর্তাবলী। ভাবা যায় বাড়িটার নাম 'আছিয়া মঞ্জিল?' বাবার কি মাথা খারাপ?

আবার সেই রিকশার পথ। থৈ থৈ আনন্দে অথৈ সকলে। বক বক করছে সকলে। এই প্রথম কথা বলে শাহেদ– মেলার ওই পান্না লোকটি

সকালের আলো ফুটবার আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কাজলের অভ্যাস। কখনো সে হাঁটতে যায়। কখনো সে ছাদে ওঠে। – ভোরবেলার তুলনা নেই। একদিন পথ হাঁটতে হাঁটতে পবিত্র বলেছিল। পবিত্র বা মমতা এক একদিন সঙ্গে থাকে। না হলে একা হাঁটে কাজল। মাঠ ঘাট ছাড়িয়ে কখনো। কালরাতে ভূতের গল্পে রীনু-বিনু ভয়ে একেবারে বেনের পুটুলি হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘুমোচ্ছে। এখন ওরা উঠবে না। মিঠুপা উঠে গুন গুন করে কি যেন পড়ছে। আব্বার আছে কবিতার খাতা। মার আছে জমাখরচ। বয়সে কে বড়। বোধকরি মা। পান্নার আছে আনন্দের হাওয়ামিঠাই আর শাহেদের অংকের খাতা। বয়সে কে বড়? বোধকরি শাহেদ। কাজল যে কোনদিন বড় হবে না এ সকলে

বড় বাচাল। এইসব লোক ছোট ছেলেমেয়ের জন্য ক্ষতিকারক।

আর আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে কল্যাণের দূত, পরমপিতা মনে করেন? এইসব শব্দ ও শিখেছে মিঠুআপার কাছ থেকে। যখন বলে– এই যে তোমার পরমপিতা এসে গেছে যে তোমাকে আমার শাসন থেকে বাঁচাবে। পরমপিতা মানে আব্বা।

কাজলের কথায় শাহেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। বলে– তোমাদের মত অবুঝদের কাজ শেষে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, এজন্যে আমাদের প্রয়োজনীয়তা কোনদিন ফুরাবে না।

আমরা অবুঝ নই।

তোমরা ছোট।

এবং আপনি নিজেকে অনেক বড় মনে করেন।

আমি অবশ্যই তোমাদের চেয়ে বড়।

আপনি বোরিং। পান্নাভাই মেলায় না এলে কি হত আজ। বোরিং মানুষের বোরিং ঘোরাঘুরিতে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে হত।

শাহেদ বোধকরি রেগে গেছে। বলে– আমার সঙ্গে তিন তিনটে মেয়ে। তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। বোরিং? খুব ইংরেজি শিখেছ মনে হয়। দায়িত্ব ভুলে যেতে বল?

তার মানে এই নয় আমরা যখন হাসব আপনি হাসবেন না। আমরা যখন খুশি হব আপনি ব্যক্তিত্ব পাহারা দেবেন। আমরা যখন আনন্দ পাব আপনি গরম চোখে তাকাবেন। ইস্ কি আমার দায়িত্ববানরে।

আর আমরা যখন নাগরদোলা থেকে ভেংচি কাটব আপনি রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকবেন। এই বলে রীনু হেসে ওঠে। বলে– চাচু পান্নামামা আপনার চাইতে অনেক বেশি মজার। আমাকে হাওয়াই মিঠাই, গরম জিলাপি আরো কত কি কিনে দিয়েছে। আমার একটাকার মধ্যে মাত্র দশআনা খরচ হয়েছে।

আমার মাত্র আটআনা। এখনো অনেক টাকা-পয়সা আমার পার্সে আছে। বলে কাজল।

আমার একপয়সাও খরচ হয়নি। বলে রীনু।

এতসব প্রশংসার পর শাহেদ আর কি বলবে? কেবল বলে– তোরা এক নম্বরের নেমকহারাম। তারপর সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, এত বড় একটা শব্দ ব্যবহারের ধকল সামলায়। তাতে ওদের কি? ওরা আনন্দের নদীতে ভাসতে ভাসতে নাচতে নাচতে বাড়িতে এসেই বলে– মা নানু আজ যা মজা হল না। দেখ না কতকিছু এনেছি তোমাদের জন্য।

মা, মিঠুপা, বুবু সকলেই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আর একটু দেরি হলেই আব্বা মাঠের দিকে রওনা দিতেন। সেইমতই কথাবার্তা চলছিল। ওদের খুশির দিকে তাকিয়ে আর কেউ কোন কঠিন কথা বলে না। আব্বা বলেন– আমার জন্য কি এনেছ তোমরা শুনি।

ছোট-বড় নানা প্যাকেট। হাওয়াই মিঠাই এখন এক দলা লাল চিনি। সকলের জন্য চার চারটে হাওয়াই মিঠাই কিনেছিল রীনু-বিনু। কিন্তু অন্য প্যাকেটের অবস্থা এত খারাপ নয়। বাতাসা, খাজা ভালই আছে। ওদের আনন্দের চাপে গলে যায়নি। বিনু বলে– দেখ কতসব জিনিস তোমাদের জন্য।

কাজল সেই বিশেষ প্যাকেটটি মিঠুপার হাতে দিয়ে বলে– এটি তোমার জন্য। মেলায় পান্নাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কাজল চেয়ে দেখে কোন কথা না বলে সেই বিশেষ প্যাকেটটি হাতে নেয় মিঠুপা। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কাজল অবাক হয়।

ষোল.

সকালের আলো ফুটবার আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কাজলের অভ্যাস। কখনো সে হাঁটতে যায়। কখনো সে ছাদে ওঠে। – ভোরবেলার তুলনা নেই। একদিন পথ হাঁটতে হাঁটতে পবিত্র বলেছিল। পবিত্র বা মমতা এক একদিন সঙ্গে থাকে। না হলে একা হাঁটে কাজল। মাঠ ঘাট ছাড়িয়ে কখনো। কালরাতে ভূতের গল্পে রীনু-বিনু ভয়ে একেবারে বেনের পুটুলি হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘুমোচ্ছে। এখন ওরা উঠবে না। মিঠুপা উঠে গুন গুন করে কি যেন পড়ছে। আব্বার আছে কবিতার খাতা। মার আছে জমাখরচ। বয়সে কে বড়। বোধকরি মা। পান্নার আছে আনন্দের হাওয়ামিঠাই আর শাহেদের অংকের খাতা। বয়সে কে বড়? বোধকরি শাহেদ। কাজল যে কোনদিন বড় হবে না এ সকলে জানে। কাজলও জানে। মাঠ ঘাট আর গাছ তাকে চিরকাল টানবে। সে এদের ফেলে কখনো বড় হবে না। যখন বড় হবে এরাও সঙ্গে থাকবে। এমন শহরে সে কোনদিন যাবে না যেখানে গাছ নেই। এবারে যেতে হবে এ শহরের সুন্দরবনে। একদিন। পান্নার ওপর ভর করে। মনে মনে এমন এক ইচ্ছে আছে।

রিকশা এসে থামে বাড়ির সামনে। রিকশাটাকে কাল রাতে বলা হয়েছিল। ব্যাগ হাতে শাহেদ রিকশায় উঠছে। কাজল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। শাহেদ কাজলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। এখনো এ বাড়ির কেউ ওঠেনি। সকাল সাতটার ট্রেন ধরবে ও। রাতেই বলা-কওয়া শেষ করেছে বুবু। চা খাবে হয়তো স্টেশনের চায়ের দোকানে শাহেদ।

চললাম। বলে শাহেদ।

কাজল কিছু বলে না। তাকিয়ে দেখে। কাল আসবার পথে বোরিং টোরিং বলেছিল মনে আছে হয়তো। রিকশায় উঠতে উঠতে বলে ও– তুমি কিন্তু মোটেই বোরিং নও। যখন হাসো এই পৃথিবী আলো হয়ে যায়।

কাজল এসব কথায় বিস্ময়কর বড় বড় চোখে বুঝতে চেষ্টা করে এই ভোরে এসব বলবার মানে কি। কি দরকার এসব কথায় কাজলকে ভোলাবার।

শাহেদ রিকশায় উঠে বসেছে। কাজল বলে– আসলে আমি ঝগড়ার জন্য অনেক বাজে কথা বলেছি। আপনি ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। দায়িত্বজ্ঞানে অতুলনীয়।

শাহেদ কি যেন বলতে চায়। বলা হয় না। রিকশা নিরিবিলির গাছেদের বাগান ছাড়িয়ে পড়েছে বড় রাস্তায়।

কাজল তাকিয়ে দেখে ভোরের সূর্য কাঠবেড়ালির সঙ্গে পালস্না দিয়ে বিশাল অর্জুন গাছে আটকে আছে। কিন্তু অর্জুন গাছ কি সূর্যের সঙ্গে পারবে? মোটেই নয়। সূর্যকে পথ করে দিতেই হবে। মন খুশি কাজলের আজ স্কুলে যেতে হবে না।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

Triple Action

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

মহাজীবন

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন

আনারুল হক আনা

'হরিজন' শব্দবন্ধে তথাকথিত অস্পৃশ্য বা অবর্ণ হিন্দুদের সমষ্টিগতভাবে নামকরণ করেছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) পুণে চুক্তির পর। তবে নামটি গান্ধীজীর উদ্ভাবন ছিল না– এক অস্পৃশ্য পত্র লেখকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। গুজরাটের কবি সন্ত নাকি ওটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ভিন্ন প্রসঙ্গে। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী অস্পৃশ্য হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অনশন করছিলেন। গান্ধী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, স্বতন্ত্র নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে, অস্পৃশ্যদের রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করে দেওয়া। অথচ বর্ণপ্রথার বিলোপ না হলে ভারতের জাতীয় সংহতি মজবুত হওয়ার সুযোগ নেই। ঐ সময় নিষ্পেষিত অস্পৃশ্য হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ড. আম্বেদকর। অবশেষে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে আসন সংরক্ষণের নীতির মাধ্যমে বর্ণ হিন্দু ও অবর্ণ (অস্পৃশ্য) হিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল। এটাই ছিল পুণে চুক্তি। এ চুক্তির ফলে অবর্ণ হিন্দুদের জন্য অনেকগুলো আসন সংরক্ষণ করা হয়। যে আসনগুলোয় প্রথমে অবর্ণরাই ভোট দিয়ে প্রার্থী মনোনয়ন করবে। তারপর হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। এ চুক্তির পর অবর্ণ হিন্দুদের সরকারি মতে নামকরণ হয়েছিল তপসিল জাতি (Sheduled Caste) আর মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া নাম হরিজন। এরপর থেকেই গান্ধীজী অবর্ণ হিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

হরিজনেরা মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া হরিজন বা ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া তপসিল জাতি হিসেবেই পরিচিত নন; পুরাকাল থেকেই পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে আসছেন। আর্যদের আগমনের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি ঘটে। হরিজনদের প্রাথমিক পর্যায়ে শূদ্র বর্ণে ফেলা হত। পরবর্তীকালে শূদ্ররা নয় শাখায় বিভক্ত হয়ে নবশাখা নাম ধারণ করে।

তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। নবশাখাকে ভিন্ন মতে নবশায়ক বলা হয়েছে। যার অর্থ 'নূতন বাণ'। এছাড়াও তারা পঞ্চম, অবনত, অস্পৃশ্য, নিম্ন, অবর্ণ, নিপীড়িত শ্রেণী, দলিত প্রভৃতি নাম ধারণ করেছে। সমষ্টিগতভাবে এরা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হলেও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা কঠিন। কারণ হিন্দু সমাজের জীবনচর্চার সর্বজনীন রূপ নেই– ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্ণভেদে বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়।

অবয়ব, নৃতত্ত্ব, ভাষা, আহার, গৃহনির্মাণ, পূজা, মন্দির, সবকিছুর মধ্যেই আছে বৈচিত্র্য। হরিজনদের উৎপত্তি হিন্দু সমাজের আদিকালের চতুর্বর্ণের শূদ্র থেকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পথে শূদ্রের মধ্যেও আরো অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অনুলোমপ্রতিলোম বিয়ের ফলে সৃষ্ট সঙ্কর জাতিসমূহকেও হরিজনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমষ্টিগত জীবনপ্রবাহ থেকে হরিজনদের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

ক. সমাজের নিম্নমান হিসেবে চিহ্নিত পেশায় হরিজন নিয়োজিত। যেমন– সুইপার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, মুচি, কুমার, শবদাহক, পুটুলী, মালী, তিলী, বেতবাঁ শের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক ইত্যাদি।

খ. ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অজ্ঞ। আধুনিক একাডেমিক শিক্ষায়ও অনেক পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী।

গ. আদিম পদ্ধতির বর্ণ বা গোত্রভিত্তিক সামাজিক সংস্থা বিদ্যমান। সমাজের প্রধান মণ্ডল বা অন্য নামে পরিচিত।

ঘ. তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শুচি রক্ষার তাগিদে এদের স্পর্শ করা খাদ্য, পানি গ্রহণ করে না। বর্তমানে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ঙ. বর্ণ হিন্দুদের ব্যবহার্য বিশেষ বিশেষ রাস্তায় চলাফেরা এবং কূপ, জলাশয় ইত্যাদির ব্যবহার হরিজনদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এ অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে।

চ. বেদ, গীতা, পূরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পরিধেয় পোশাকেও ছিল বিধিনিষেধ। বর্তমানে এ অপপ্রথায় পরিবর্তন এসেছে।

ছ. এদের মধ্যে সাধারণত অন্তর্বিবাহবহির্বিবাহ (Endogamy-Exogamy) বিদ্যমান। অর্থাৎ নিজ বর্ণ বা জাতের মধ্যেই পরিণয় হয়; তবে নিজ বংশ বা আত্মীয়ের মধ্যে নয়।

জ. এরা অনেকেই শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করে থাকেন। তবে বর্তমান প্রজন্ম মদ্যপানে না বলছে। শূকরের মাংস ভক্ষণও কমে এসেছে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যেতে পারে, প্রাচীন আর্য সমাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্নদের সৃষ্ট শ্রেণিবিভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তথাকথিত যে বিভিন্ন নামের নিম্নজাতির রূপ দেওয়া হয়েছে, সমষ্টিগতভাবে তাঁরাই অস্পৃশ্য, হরিজন, তপসিল জাতি।

ভারতবর্ষের বর্তমান সভ্যতার আলোকবাতি জ্বলে ওঠার শুরুন থেকেই বিভিন্ন শিরোনামে পরিচিত হয়ে ওঠা কায়িক পরিশ্রমী এ মানুষগুলোর প্রতি অবজ্ঞার বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদগম ঘটে। আজ তার পরিসমাপ্তি হয়েছে এমন দাবি করার সুযোগ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের ঝংকার, কখনও কামানের গোলায় ছোট ছোট জনপদগুলোর সীমানা বিলীন হয়েছে। এসেছে বৃহদাকৃতির সাম্রাজ্য, সামন্তবাদ থেকে উপনিবেশ। উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক জ্ঞানে উন্মেষিত হয়েছে গণতন্ত্র। তবে কোন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেই ঐ কায়িক শ্রমজীবীরা নিপীড়নের ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। শাসন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের সঙ্গে বঞ্চনায় এসেছে নতুন নতুন পদ্ধতি। কখনও কখনও বিচক্ষণ পুরোহিতরা তলোয়ারবাজদের প্রভাবিত করে, কিংবা তলোয়ারবাজরাই পুরোহিতদের দিয়ে ফেঁদেছে নিপীড়নের নতুন উপযোগী তত্ত্ব। মনগড়া ভাবনাকে বলেছে ধর্মের আইন। তাদের কুট চালের ধাক্কায় আড়ালে চলে গেছে মানবিক বোধ। ভারতবর্ষের বুকে মধ্যপ্রাচ্যের আরবি ঘোড়দৌড়, পশ্চিমা শেতাঙ্গদের বন্দুকবার ুদের গন্ধ বিস্তারের প্রধান কারণ ছিল স্বদেশী পুরোহিতদের ধর্মের সঙ্গে মনগড়া তত্ত্বের সংযোজন। শিক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ থেকে বিচ্যুত রেখে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মানবসম্পদ হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে ভারত অনৈক্যের স্তরে এক বিশাল জনবহুল অরক্ষিত রাষ্ট্র হিসেবেই প্রকাশিত হয়। ভিন্‌দেশিরা সহজেই বার বার এখানে প্রবেশ করে প্রভূত্বের থাবা বসায়। তারা মানুষের কঠোর শ্রমে অর্জিত অর্থনীতিকে চাবুকের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে বিলাসী ভোগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ভারতের মাটির স্বত্ব জোঁকের মত শুষে নিয়ে চালান করে আপন দেশে। জীর্ণশীর্ণ শোষিত মানুষ বার বার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে জীবিকার অভাবে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন।

সনাতন তত্ত্বের অসম নীতি থেকে অনেকেই ইসলাম ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলামে বর্ণভেদের দেওয়াল না থাকলেও সনাতন সমাজের রীতিনী তি অনেকটাই সচল। তাই ধর্ম পরিবর্তন করেও অনেকের পরিণতি পূর্বের অবস্থানেই থেকে যায়। বেদে, জোলা, খুলু, হাজাম প্রভৃতি বংশগত পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী বৃহৎ সমাজের কাছে অবজ্ঞা ও অসম্মানের মানুষ হিসাবেই পরিগণিত হয়ে আসছে।

ভারতবর্ষকে এ শোচনীয় অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য উনবিংশ শতাব্দী থেকে মানবতাবাদী কার্যক্রম শুরন্ন হয়। রাজা রামমোহন রায়, জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের ব্রাহ্মসমাজ গঠন, কুষ্টিয়ার লালন শাহ্‌র বাউল সঙ্গীত, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সত্যাগ্রহ, ড. আম্বেদকরের নিম্নবর্ণের আইনী অধিকারের লড়াই– এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন, সংবিধানে কোন বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ সুবিধা নয় বরং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে বর্ণভেদের অবসান। ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মীয় দর্শনে মানুষের কল্পিত কাহিনির সংমিশ্রণ ঘটে সনাতন সমাজের যে করুণ পরিণতি হয়েছে, তার সংস্কার চেয়েছিলেন তিনি; অভিন্ন হিন্দু সমাজ নির্মাণের জন্য ধর্মীয় বিশেষণমূলক প্রবন্ধ রচনা, আশ্রম স্থাপন, প্রার্থনা সভা, প্রচারণাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন ধর্মের বিলুপ্তি নয়; সকল ধর্মের মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রেখে অখণ্ড স্বাধীন ভারত চেয়েছিলেন এ মহৎ মানুষটি। তাঁর এ সরল ভাবনার কঠিন কার্যক্রমকে গ্রহণ করতে পারেনি গোঁড়া ধারণায় বিশ্বাসী মানুষ। কুসংস্কারপুষ্ট মানুষগুলো গান্ধীজীকে হিন্দুসমাজের শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। ফলে বাপুজীকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাতে হয় স্বাধীন ভারতে। এদিকে স্বাধীন ভারতে তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুদের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা নেন ড. আম্বেদকর।

সাদা চোখে এ দুই মহৎ ব্যক্তির সামাজিক আন্দোলন তাঁদের মৃত্যু দিয়েই যবনিকা ঘটেছে বলে মনে হবে। বাস্তব প্রেক্ষাপটে এ ধারণার ভিন্ন চিত্র স্পষ্ট। তত্ত্ব ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের রেখে যাওয়া কর্মসূচি সক্রিয়। স্বাধীন ভারতে আজ আইনী অধিকার আদায়ের কণ্ঠ বেজে উঠছে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও। ২০১২ সালের ১৭ ডিসেম্বর অল আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ অসমের কর্মীদের দিলিতে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। তারা সড়কে নেমে তপসিল উপজাতীয় ক্যাটাগরিতে সকল আদিবাসীর নাম তালিকাভুক্তির দাবি উত্থাপন করে।

কর্মব্যাপ্তি ছোট বা ক্ষুদ্র হবার কারণে বৃহৎ সমাজে গান্ধীজী বা ড. আম্বেদকরের মত আলোকিত না হয়েও মহৎ অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, ইউরোপআ মেরিকাভিত্তিক ধর্মীয় মিশন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রচেষ্টায় তথাকথিত নিম্নজাত ও নৃগোষ্ঠীগুলোর মাঝে আসছে পরিবর্তন; তাঁদের আর্থিক, একাডেমিক উন্নতি ও চেতনাবোধ প্রাচীন কুসংস্কার ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনছে। গোত্র, জাতি, বর্ণগত দেয়ালগুলো ক্রমশ ভেঙে পড়ছে এবং বৃহৎ বা মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তবুও নিম্ন আয় ও কায়িক শ্রমের মানুষগুলো বঞ্চনা থেকে মুক্ত নয়। ২৯শে এপ্রিল ২০১৪ ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আহমেদ নগরের খারদা গ্রামের নীতিন রাজু নামে ১৭ বছরের এক কিশোরকে উচ্চ বর্ণের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রেমিকার ভাইয়েরা তাকে হত্যা করে। এলাকাবাসী এ ঘটনার বিরুদ্ধে হরতাল পালন করে। থানাতে মামলাও হয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে, ভারতবর্ষ বর্ণবাদী চেতনার অবসান হয়নি। এ ধারণাও দেয়, দলিতরা আর উচ্চবর্ণের নিষ্পেষণ মানতে রাজী নয়।

তারা এখন সচেতন ও প্রতিবাদী। তবে এ কথাও সত্য, প্রাচীন দেয়ালগুলো ভেঙে আবারো নির্মিত হচ্ছে দলনের নতুন প্রক্রিয়া।

মানব সমাজের উৎপত্তিই হয়েছিল প্রাকৃতিক পরিবেশে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারা পৃথিবীর শরীরে বংশ বিস্তার করেছে। সৃজনশীল ভাবনা ও কঠোর কায়িক পরিশ্রমের ফলে সামাজিক পরিবেশ বা সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। কালের প্রবাহে সব জনগোষ্ঠী একইসঙ্গে একইভাবে সামাজিক পরিবেশে সমান অংশীদারিত্ব পায়নি। মানবিক বিবেচনায় এ জন্য কেউ ছোটবড় মর্যাদায় শ্রেণিকরণ হতে পারে না। সামাজিক পরিবেশই মানুষকে বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়নের আশ্রয়ে নিয়ে গেছে। এজন্য দায়ী মানববোধে হিংসা, লোভ, প্রভুত্ববাদী চেতনা প্রভৃতি। তীক্ষ্ণ মেধা অনুশীলনকারীরা নতুন নতুন ফন্দি এঁটে মানুষকে নিয়ে গেছে অস্পৃশ্যের কাতারে। এ বর্ণবাদ, সামাজিক নিপীড়ন, প্রাচীন কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণার বিপক্ষে বর্তমান সুচিন্তিত মানুষের অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে সন্দেহ নেই।

উপমহাদেশীয় মানবসম্পদ উন্নয়নে এ প্রক্রিয়করণে বড় অবদান রেখেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি দেখেছিলেন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের কাছে সমগ্র ভারতবাসীই অস্পৃশ্য। তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে অস্পৃশ্য বিবেচনায় পদে পদে লাঞ্ছনা করে। প্রথম শ্রেণির টিকিট কেটে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাওয়ার পথে পিটারমরিৎস্বুর্গ স্টেশনে শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর অভিযোগে তাঁকে রেল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। প্রচ- শীতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে সারারাত কাঁপতে কাঁপতে গান্ধী তাঁর কর্তব্যকর্ম স্থির করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন নিজেকেই, দেশে ফিরে যাবেন, না কি এ অন্যায়ের শেষ দেখবেন? তিনি অন্তরে অনুভব করেন, এ প্রশ্নের উত্তর কেবল একটি ব্যক্তির নয়; একটি জাতিরও উত্তর। আর কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নয়; ভারতের ভারতীয়দেরও উত্তর।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সুদীর্ঘ দিনের বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্য প্রথা ইউরোপীয়দের মধ্যে স্পর্ধার সৃষ্টি করেছে। হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হলেও মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যেও এর বিস্তৃতি ঘটে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রবঞ্চনার কষাঘাত থেকে নিম্নবর্ণের নিরীহ মানুষদের মুক্তি এনে না দিতে পারলে ইউরোপীয়দের নিপীড়ন বন্ধ করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তবতাও অনেক দূরে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সত্যাগ্রহ নামে দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের প্রচার শুরু করেন। যার সূচনা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে। তিনি লেখেন 'হিন্দু স্বরাজ'। হিন্দু স্বরাজই তার দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের ম্যানিফেস্টো। ১৯১৫ সালে আহমেদাবাদে স্থাপন করেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। তিনি বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদের প্রচার অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন শিরোনামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলো *ইয়ং ইন্ডিয়া, হিন্দি নবজীবন, হরিজন* পত্রিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়। তার বিশেষ বিশেষ অংশ এখানে উপস্থাপন করা হল:

ইয়ং ইন্ডিয়া ২৭ এপ্রিল ১৯২১

শ্রীযুক্ত গান্ধী ও নিপীড়িত শ্রেণী: আমি ভাবিতাম,'বর্ত্তমানে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা হয়, সেইরূপ এক ব্যক্তির নৌকায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা পার হইয়াছিলেন একথা যে রামায়ণে আছে, সেই রামায়ণ কতকগুলি লোককে কিরূপে 'কলুষিত' ও অস্পৃশ্য বলিবে! ভগবানকে আমরা 'পতিতপাবন' 'অধমতারণ' বলিয়া থাকি। ইহা হইতে বোঝা যায় কোন হিন্দুকে পতিত অথবা অস্পৃশ্য মনে করা পাপ– ইহা শয়তানী। আমি সব সময় বলিয়া আসিতেছি ইহা মহাপাপ। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অংশ নহে। যদি ইহা অংশই হইত, তবে এরূপ হিন্দুধর্ম আমার জন্য নহে।'

'সত্য বটে হিন্দুশাস্ত্র অস্পৃশ্যতাকে পাপ মনে করে না। কিন্তু আমি শাস্ত্রের অর্থ লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে চাই না। ভাগবৎ ও মনুসংহিতার শোক উদ্ধৃত করিয়া আমার কথা সমর্থন করা শক্ত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ আমি বোধহয় জানি। অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিয়া হিন্দুরা পাপ করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে হীন করিয়াছে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি মুসলমানদের ভিতর এই পাপ সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, কানাডার হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদিগকে কম অস্পৃশ্য মনে করা হয় না। 'অস্পৃশ্যতা পাপ' হইতে এসব অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়াছে।'

'সম্ভবত ৬ এপ্রিলে আমি নেলোরে ছিলাম। সেখানে আমি অস্পৃশ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং আফ্রিকার ন্যায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি মোক্ষলাভ করিতে চাই। আমি আবার জন্মগ্রহণ করিতে চাই না। কিন্তু যদি আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে আমি যেন অস্পৃশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করি। এইরূপে আমি তাহাদের দুঃখকষ্ট অনাদর অবজ্ঞার ভাগী হইতে পারিব এবং নিজেকে ও তাহাদিগকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিব। এজন্য আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যদি আমাকে আবার জন্মিতে হয়, তবে আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে না জন্মিয়া অতিশূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করি।'

'তোমরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া থাক, তোমরা ভাগবত পড়িয়া থাক। হিন্দুরা যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে জানিও দোষ হিন্দুদের নহে, দোষ যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের। তোমরা যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে শুদ্ধ হও। মদ খাওয়ার ন্যায় খারাপ অভ্যাস ত্যাগ কর।'

হিন্দি নবজীবন ১১ মে, ১৯২৪

অস্পৃশ্য সম্মিলন: 'হিন্দু জাতির রগে রগে অস্পৃশ্যতা পাপ প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য পাপকে তারা পুণ্যজ্ঞান করে। যাহাকে সমস্ত জগৎ পাপ মনে করে, যার জন্য হিন্দু পৃথিবীর সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, তাহা আমাদের নিকট পাপ ঠেকে না।'

হিন্দি নবজীবন ২২ জুন, ১৯২৪

অস্পৃশ্যতা ও স্বরাজ: 'ভারতের ঘাড় হইতে ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্র সরিলেই আমি আনন্দিত হইব না। আমি সব রকম কুহক দূর করিতে চাই। ভূতকে সরাইয়া, পিশাচকে আমি গদীতে বসাইতে চাই না। এজন্য স্বরাজ আন্দোলনকে আমি আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বলি।'

হিন্দি নবজীবন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

হিন্দু ধর্মের তিন সূত্র: 'এই হিন্দুধর্ম্মের বর্ণনা ভগবান শঙ্করচার্য্য এক কথায় করিয়াছেন– 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।' অপর এক ঋষি বলিয়াছেন– 'সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নাই।' তৃতীয় একজন কহিয়াছেন– 'হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ অহিংসা।' এই তিনটির যে কোন একটি সূত্র আপনারা গ্রহণ করুন, ইহার ভিতর হিন্দুধ র্ম্মের রহস্য পাইবেন। এই তিনটি সূত্র কি? এই সূত্র তিনটি হিন্দুধ র্ম্ম শাস্ত্র হইতে দোহন করা দুগ্ধের নবনীত-স্বরূপ।'

ইয়ং ইন্ডিয়া ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫

রাজকোটের আতিথ্য: 'আমি বহুবার বলিয়াছি শাস্ত্রে 'অস্পৃশ্য' শব্দের উলেখ নাই। জন্মহেতু যদি কেহ ঢেড় ভাঙ্গী হয়, তবে ইহাতে কি যায় আসে? চণ্ডাল নামে কোন জাতি নাই, ঢেড়ই বা কোন্ জাতি? এ শব্দ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে কি? ঢেড়ের অর্থ বস্ত্রবয়নকারী, ভাঙ্গীর অর্থ পায়খানা সাফকারী। আমি এখনও তাঁতী ও মেথর। আমার মাতাও এক শব্দে 'মেথর' ছিলেন, কারণ শিশুকালে তিনি আমার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। আপনাদের জননীও ময়লা সাফ করিয়াছেন। সীতাদেবী প্রাতঃস্মরণীয়। তিনিও বহুত ময়লা সাফ করিয়াছিলেন– তিনিও 'মেথর' সাজিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য মাকে আমরা ত্যাগ করি নাই; তবে কেন ভাঙ্গীকে (মেথর) আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব। যদি সমস্ত শাস্ত্রী (পণ্ডিত) আমার বিরুদ্ধে থাকিতেন, তথাপি আমি ঘোষণা করিতাম হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর অস্পৃশ্যতার স্থান নাই– অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অংশ নহে।

ইয়ং ইন্ডিয়া, ১২ মার্চ, ১৯২৫

এমডিএনএর প ৎতি: অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য

‘ভগবান কৃষ্ণ এও লিখেছেন, যদি প্রকৃত ভক্ত হতেই হয়, তবে ব্রাহ্মণে-মেথরে ভেদাভেদ করলে চলবে না। যদি তা সত্য হয়, তবে হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার ঠাঁই থাকতে পারে না। আজ জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে এটা ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধি করা উচিত। গীতার প্রতি যথার্থ নিষ্ঠাবান কোন লোক, হিন্দু ও মুসলমানে ভেদ করবে না। কেন-না ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যে কেউ যে কোন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করুক– উপাসনা যদি নিখাদ হয়, তবে তা তাঁরই উপাসনা। গীতাতে প্রতিপাদিত ভক্তি-কর্ম ও প্রেমের মার্গে মানুষকে ঘৃণা করার কোন জায়গা নেই।’

হে রাম– বিড়লা মন্দিরে গুলিবিদ্ধ গান্ধীজীর শেষ উচ্চারণ

আছে। অস্পৃশ্যতার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায় না। ইহা মানুষকে সেবার অধিকার হইতে ও বিপন্ন অস্পৃশ্যকে সেবার দাবি হইতে বঞ্চিত করে। জাতিভেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ইহা যুক্তিহীন নহে। ইহার দোষগুণ দুইই আ ছে। জাতিভেদ ব্রাহ্মণকে শূদ্র ভাইয়ের সেবা করিতে নিষেধ করে না। ইহা সামাজিক ও নৈতিক সংযম শিক্ষা দেয়। জাতিভেদের প্রসারবৃদ্ধি করা যায় না। আমি চারিটি জাতি চাই। এই সংখ্যা অল্প– বেশি করিতে গেলেই অনর্থ ঘটিবে। আমি জাতিভেদের সংস্কার চাই, ইহা উঠাইয়া দিবার সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। জাতিভেদের মধ্যে ‘ছোটবড়’র কথা নাই। যে ব্রাহ্মণ নিজকে শ্রেষ্ঠ ভাবিবে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই তাহার জন্ম এরূপ মনে করিবে, সে ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণ যদি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, তবে সেবার গুণে তাহা করিয়াছেন।

হরিজন, ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৭

হরিপাদে ভাষণ: ‘ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের সার নিহিত আছে।
ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যক্তিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।
সামান্য সংস্কৃত জানা লোকও দেখবেন, এ অন্য বৈদিক মন্ত্রের মতো দুর্বোধ্য নয়। এর সিধাসাদা অর্থ এই: বিশ্বে ছোটবড় যা কিছুই আ ছে, তাতে, এমন কি ক্ষুধাদারিদ্র্য অণুতেও, ঈশ্বরের সত্তা ব্যাপ্ত– যাঁকে আমরা স্রষ্টা, বা প্রভু বলে জানি।
এই মন্ত্র মনে রেখে আমি এখন ভাবতে বলি, সরকারী ঘোষণার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। কারণ, ব্রহ্মাং- সর্বত্র যদি ঈশ্বর বিরাজিত থাকেন; যদি ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গী, পণ্ডিত ও মেথর, হলোরা ও পারিয়া সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজিত– তবে এ মন্ত্রের দৃষ্টি অনুযায়ী সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি– উঁচু নেই, নীচু নেই, সবাই সমান। এই ধর্ম ও দর্শন এমন কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, যা শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পালন করবে। এতে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এক সনাতন সত্য। তাকে সবাই মর্যাদা দিতে পারে। তাই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বা মহারানী, অন্য কোন ব্যক্তি থেকে কিছুমাত্র উচ্চজাতি নন। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান তাঁর সেবক মাত্র। মহারাজ যদি তারই সমান অন্যলোকদের মধ্যে প্রথম হন (বাস্তবে তো তাই আছেন)– সেটা রাজত্ব থাকার কারণে নয়– ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার কারণে।’

ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৪ নভেম্বর ১৯২৭

হিন্দু ধর্ম আমাদের জন্য কি করেছে?: ‘আজ বর্ণাশ্রমধর্ম আর হিন্দু ধর্মকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করছে ধর্মোপাসকরা। এটা দূর করে সংশোধন করতে হবে। আমরা অন্তরে সত্য হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করব ও জানতে চাইব, তা আত্মাকে সন্তুষ্ট করছে কিনা। ’

ইয়ং ইন্ডিয়া, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১

লসেনের সভায় ভাষণ: ‘হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানে আরো বলেছে, একা ঈশ্বর অস্তিত্ববাদ, আর কোন বস্তুর সত্তা নেই। ইসলামে যে প্রসিদ্ধ উক্তিকে ‘কলমা’ বলা হয়, তাতে এ কথাই জোর দিয়ে বলা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি ইবাদতে কথাটি দু’বার বলতে হয়– সেই সরল কথাটি হল, শুধু আলাহ্ আছেন, আর কিছু নেই। এ কথা সত্যের সঙ্গেও জড়িত। সংস্কৃতে সত্যার্থে শব্দটি হল ‘সৎ’– তার মানেও হল ‘যা আছে’।

ইয়ং ইন্ডিয়া, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭

আরসিকেরে জনসভায় ভাষণ: ‘ভগবান কৃষ্ণ এও লিখেছেন, যদি প্রকৃত ভক্ত হতেই হয়, তবে ব্রাহ্মণে-মেথরে ভেদাভেদ করলে চলবে না। যদি তা সত্য হয়, তবে হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার ঠাঁই থাকতে পারে না। আজ জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে এটা ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধি করা উচিত। *গীতার* প্রতি যথার্থ নিষ্ঠাবান কোন লোক, হিন্দু ও মুসলমানে ভেদ করবে না। কেননা ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যে কেউ যে কোন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করুক– উপাসনা যদি নিখাদ হয়, তবে তা তাঁরই উপাসনা। *গীতাতে* প্রতিপাদিত ভক্তিকর্ম ও প্রেমের মার্গে মানুষকে ঘৃণা করার কোন জায়গা নেই।’

ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৭ এপ্রিল ১৯২১

আহমেদাবাদে দলিত শ্রেণীর সম্মেলনে ভাষণ: ‘অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়। যদি তাই হয় তাহলে অমন হিন্দুধর্মে কাজ নেই আমার।’
‘অস্পৃশ্যতা অনুমোদন করে হিন্দুধর্ম পাপ করেছে। এতে আমাদেরই পতন হয়েছে। সাম্রাজ্যে আমাদের অবস্থান আজ শূদ্রের মতন, ব্রাত্য। আমাদের এই ছুঁৎমার্গী মুসলমানদেরও এর আওতায় এনেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা এবং কানাডাতেও হিন্দুদের শূদ্রই মনে করা হয়। অস্পৃশ্যতার পাপ থেকেই এ সব দোষ উৎপন্ন হয়েছে।’

ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭

অকোলায় অস্পৃশ্যতা বিষয়ে ভাষণ: ‘আমি বুঝি না, যখন শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণের উলেখ নেই, *গীতায়* ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গীকে সমান মনে করবার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, তখন হিন্দুধর্মের কপালে এ কলঙ্কতিলককে কায়েম রাখার জিদে আমরা এমন অন্ধ কেন? ভাঙ্গী ও ব্রাহ্মণকে সমান বলে মানার অর্থ এ নয় যে সাচ্চা ব্রাহ্মণকে আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করব না। এর অর্থ হল, ভাঙ্গীরও অন্যান্য হিন্দুর মত আমাদের কাছ থেকে সেই সেবা পাবার অধিকার আছে, যা ব্রাহ্মণের আছে।’

আনারুল হক আনা
প্রাবন্ধিক

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন ড. দুলাল ভৌমিক

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু- কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজ-সরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উলেস্নখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা-ই রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। এ-কাজে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরম্ন হল রম্ভা-উর্বশীর নৃত্য-গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ক্ষমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্য-খচিত একটি বহুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কি-না তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপতি বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কি-না।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিক্ষেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্য-বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা পঞ্চবিংশতম পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক ষড়বিংশ, সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ ও ঊনত্রিংশ পুতুলের গল্প:

ষড়বিংশ পুতুলের গল্প

কিছুক্ষণ নীরবে নিশ্চল থেকে ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে অরোহণের উদ্যোগ নিলেন। তা দেখে ষড়বিংশ পুতুলটি বলল: হে রাজন! আপনি এই সিংহাসনে বসার যোগ্য বিবেচিত হবেন, যদি আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ধৈর্যশীল ও জীবে দয়াবান হন।

ভোজরাজ বললেন: কিরকম?

পুতুলটি বলল: একবার দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজের মহানুভবতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি স্বর্গের কামধেনু সুরভিকে সাধারণ গাভীরূপে মর্তে পাঠালেন। গাভীটি এক বনে বিচরণ করছিল। হঠাৎ গভীর পাঁকে পড়ে সে আটকে গেল। আর উঠতে পারছে না। তা দেখে কয়েকটা বাঘ তাকে খাওয়ার জন্য ওঁত পেতে আছে।

ঐ সময় মহারাজও মৃগয়ায় গিয়েছিলেন সেই বনে। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি এক সময় গাভীটিকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাঁক থেকে গাভীটিকে তুলতে পারলেন না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এ অবস্থায় গাভীটিকে ফেলে গেলে নিশ্চয় বাঘে খেয়ে ফেলবে। এরূপ চিন্তা করে তিনি সারারাত জেগে গাভীটিকে পাহারা দিলেন।

সকালবেলা গাভীটি নিজেই পাঁক থেকে উঠে এল। মনুষ্যকণ্ঠে মহারাজকে বলল: মহারাজ! আমি স্বর্গের কামধেনু সুরভি। দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার ধৈর্য এবং জীবের প্রতি দয়া দেখে আমি মুগ্ধ। আপনি যে-কোন বর প্রার্থনা করুন।

মহারাজ বললেন: হে দেবী! ঈশ্বরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এতেই আমি খুশি। আপনি এবার স্বস্থানে গমন করুন।

সুরভি বললেন: মহারাজ! আমার ইচ্ছা কিছুদিন আপনার মত মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করি।

মহারাজ সানন্দে সম্মত হয়ে সুরভিসহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। আর পুতুলের মুখে এ কাহিনি শুনে ভোজরাজ সিংহাসন আরোহণে বিরত রইলেন।

সপ্তবিংশ পুতুলের গল্প

বারবার পুতুলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও রত্নসিংহাসনে বসার বাসনা ভোজরাজের যায়নি। তাই তিনি নতুন উদ্যোগে আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন। এমন সময় সপ্তবিংশ পুতুলটি বলে উঠল: হে ভোজরাজ! দেবরাজ প্রদত্ত এই সিংহাসনে আপনি বসুন, কিন্তু তার আগে ভেবে দেখুন আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সহানুভূতিশীল কি-না।

ভোজরাজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুতুলের দিকে তাকালে পুতুলটি বলতে লাগল: মহারাজ একবার দেশ পর্যটনে বের হয়েছেন। ঘুরতে-ঘুরতে

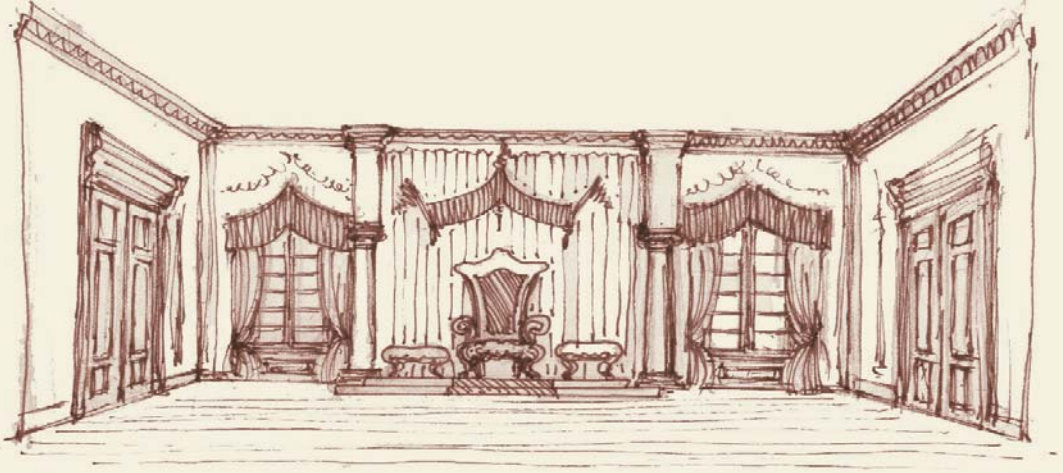

একদিন তিনি এক দেবালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। দেবালয়ের পরিবেশ তাঁর খুব ভাল লাগল। তিনি স্থির করলেন কয়েকটা দিন এখানে থাকবেন। প্রাবন্ধিক

মহারাজ একদিন দেবালয় প্রাঙ্গণে বসে আছেন। এমন সময় বহুমূল্য পোশাক পরিহিত এক যুবক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে চলে গেল।

পরের দিন আবার ঐ যুবক অমনিভাবে এল এবং চলে গেল। কিছুদিন পরে তাকে দেখে মহারাজ চমকে উঠলেন! তার চেহারা মলিন। গায়ের পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন। মুখ শুকিয়ে কাঠ।

মহারাজ তার এরূপ অবস্থার কারণ জানতে চাইলে সে বলল: আমি একজন পাশাখেলোয়াড়। পাশা খেলে আমি প্রচুর ধন অর্জন করেছিলাম। কিন্তু দৈবের কারণে গত কয়েকদিন যাবৎ বারবার হেরে গেছি। তাই আজ আমার এই অবস্থা।

তার কথা শুনে মহারাজ বললেন: তুমি কেন এই সর্বনাশা পাশাখেলায় মত্ত হলে? তুমি জান না– পাশা মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়? চৌর্যবৃত্তি আর পতিতা নারীতে আসক্ত করে?

মহারাজের কথা শুনে যুবকটি অনুশোচনার সুরে বলল: জানি, কিন্তু পাশাখেলাই আমার পেশা। এ করেই আমার জীবন চলে। তবে আজ রাজা, কাল ফকির– এ জীবন আর আমার ভাল লাগে না। অনেক টাকা থাকলে অন্য পেশায় যেতাম। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই।

যুবকের কথা শুনে মহারাজ বললেন: আমি তোমায় টাকা দেব। তুমি বাণিজ্য কর। শাস্ত্র বলে না– বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ?

মহারাজের কথায় যুবকটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্মত হল এবং মহারাজের সঙ্গে রাজধানীতে গেল। মহারাজ তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন এবং সেই অর্থে ব্যবসা করে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই সহানুভূতিশীলতার কথা শুনে ভোজরাজ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অষ্টাবিংশ পুতুলের গল্প

এবার ভোজরাজ অষ্টাবিংশ পুতুলের মাথায় পা রেখে সিংহাসনে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। পুতুলটি তখন বলে উঠল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মহানুভব হন, তাহলে দেবরাজ প্রদত্ত এই দৈব সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরকম মহানুভব ছিলেন?

পুতুলটি বলল: মহারাজ একবার পর্যটনে বের হয়েছেন। পথে ভিনদেশী চার পর্যটকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা বলেন: পার্শ্ববর্তী বেতালরাজ্যে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল কামনায় প্রতিবছর একজন করে নরবলি দেওয়া হয়। কাল সেই বলির দিন। তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন।

মহারাজ কৌতূহলী হয়ে পরের দিন প্রত্যুষে সেই বেতালরাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবককে বলির জন্য কালভৈরবীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যুবকটি আর্তস্বরে চিৎকার করে বলছে: কে আছেন, আমাকে রক্ষা করুন।

যুবকটির পেছনে-পেছনে তার পরিবারের লোকজন কাঁদতে-কাঁদতে পাগলের মত ছুটছে।

মহারাজ তখন ভাবলেন: আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। আর কতদিনই-বা বাঁচব। জীবন তো আর চিরস্থায়ী নয়। তাই আমার স্বল্পায়ুর বিনিময়ে যদি এই যুবকের প্রাণ রক্ষা পায় সেটাই উচিত কাজ হবে। এ যুবক দীর্ঘকাল জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারবে।

এরূপ চিন্তা করে মহারাজ বেতালরাজের নিকট গিয়ে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। বেতালরাজ সম্মত হলে মহারাজ কালভৈরবীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অসংখ্য লোক সেই দৃশ্য দেখার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে। মহারাজ কালভৈরবীকে প্রণাম জানিয়ে নিজেই খড়্গ দিয়ে তাঁর কণ্ঠ ছেদন করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় কালভৈরবী আবির্ভূত হয়ে বললেন: বৎস! তোমার মহানুভবতায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমাকে আর জীবন দিতে হবে না। তুমি বর প্রার্থনা কর।

মহারাজ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: হে দেবী! আমার প্রতি যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তাহলে আজ থেকে এই রক্তপাত বন্ধের আদেশ দিন। তাহলেই আমি খুশি হব।

কালভৈরবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন। সেদিন থেকে বেতালরাজ্যে নরবলি বন্ধ হল এবং রাজ্যেও আর কোন অমঙ্গল রইল না। উপস্থিত সকলে মহারাজকে ধন্য-ধন্য করতে লাগল।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই মহানুভবতার কাহিনি শুনে রুদ্ধবাক্ ভোজরাজ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঊনত্রিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণের উদ্যোগ নিলেন। এবার তিনি ঊনত্রিংশ পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুলটি বলে উঠল: হে ভোজরাজ! আপনি এ সিংহাসনে আরোহণ করুন। কিন্তু তার আগে একবার ভাবুন, আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কর্তব্য-পরায়ণ কি-না।

ভোজরাজ বললেন: খুলে বল।

পুতুলটি বলতে লাগল: মহারাজ একদিন পাত্র-মিত্রসহ রাজদরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। তিনি মহারাজের উদ্দেশে আশীর্বচন করে বললেন: মহারাজ! উত্তর প্রদেশে জম্বীর নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন ধনেশ্বর। তিনি অকৃপণ হস্তে প্রজাদের দান-ধ্যান করতেন। একবার বসন্তোৎসবে তিনি না-কি এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রজাদের দান করেছিলেন। লোকমুখে আপনার কথাও শুনেছি। তাই আমার মনে হয়েছে আপনিই তাঁর সমতুল্য।

মহারাজ বললেন: হে ব্রাহ্মণ! আপনার প্রার্থনা কি তাই বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ! আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই আমার দিন কাটে। অর্থের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। দিনান্তে শাকান্ন পেলেই আমি খুশি। কিন্তু বর্তমানে আমি একটু অর্থসঙ্কটে পড়েছি। আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। অর্থের অভাবে তার বিবাহ দিতে পারছি না।

মহারাজ বললেন: হে ব্রাহ্মণ! আপনাদের কাজই হচ্ছে অধ্যয়ন করা। এটাই আপনাদের ধর্ম। আর রাজার কর্তব্য আপনাদের পরিপোষণ করা। এটা তার ধর্ম। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

এই বলে মহারাজ ভা-ারীকে আদেশ দিলেন ব্রাহ্মণের প্রার্থনা অনুযায়ী অর্থ দিতে। ভাণ্ডারী অর্থ এনে দিলে ব্রাহ্মণ মহারাজকে পুনরায় আশীর্বাদ করে স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই কর্তব্যপরায়ণতার কথা শুনে ভোজরাজ সিংহাসন আরোহণে বিরত রইলেন।

ড. দুলাল ভৌমিক

● আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

দিলিস্থর জামে মসজিদে ঈদের জামাত

পুনর্মুদ্রণ

ভারতে ঈদ উৎসব

ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। প্রতি বছর দু'টি ঈদ উৎসব পালিত হয়– একটি ঈদ-উল-ফিতর অন্যটি ঈদ-উজ-জোহা। এই দুই ঈদের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর সমধিক জনপ্রিয়। মুসলমানদের ধর্মীয় ক্যালেন্ডার চান্দ্রমাসভিত্তিক। এই চান্দ্রমাসের নবম মাস হচ্ছে রমজান। এই মাসে মুসলমানগণ সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখেন। এই রোজার সময় কোন কিছু খাওয়া অথবা পান করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। খাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এত কঠিন যে রোজা রাখা অবস্থায় ঔষধ সেবন, পানি পান অথবা কোনরকম ধূমপান করা, সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই মাসে কোনরকম ঝগড়া-বিবাদ, চুরি, মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা অথবা কাউকে গালি দেওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এর কোনরকম বিচ্যুতি ঘটার অর্থ রমজানের তাৎপর্য বিঘ্নিত হওয়া এবং এর ফলে দোষী ব্যক্তির পুণ্য অর্জনের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। যদি কেউ সামান্যতম খাদ্যবস্তুও ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করে তাহলে তার রোজা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে ধরা হয় এবং রমজান মাসের পরে এই দিনটির জন্য বাড়তি রোজা রাখার প্রয়োজন হয়।

রমজানের পুরো মাসটাই একটি উৎসব হিসেবে ধরা যায়। মুসলমানগণ এই মাসটির আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন, কারণ এই মাসের শেষে আছে ঈদ-উল ফিতর। রমজানের নতুন চাঁদ দেখা থেকেই ঈদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এই মাসে ছোট বড় সবাই বিশেষ নামাজ পড়ে। রাত্রের নির্দিষ্ট এশার নামাজ ছাড়াও তারাবি পড়া হয়। যাঁরা কোরান পাঠ করতে জানেন অথবা যাদের কোরান কণ্ঠস্থ আছে, তাঁরা সম্পূর্ণ কোরান এই একমাসে পাঠ অথবা আবৃত্তি করেন।

শেষরাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সেহরি বলা হয়। এ সময়ে যার যেমন ইচ্ছে খাবার খান। অনেকে সেহরিতে খাওয়ার জন্য দুধ দিয়ে মিষ্টি রান্না করেন এবং চা কিংবা পানি খান। সেহরির পর পরই মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যায়। এই সময় থেকে রোজার শুরু এবং রোজা শেষ হয় সূর্যাস্তের পর। মসজিদ থেকে আজান শোনার পর সাধারণত বাড়ির পুরুষ ও ছেলেরা নিকটস্থ মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। মহিলারা বাড়িতেই থাকেন এবং অজু করে বাড়িতেই নামাজ পড়েন এবং কোরান পাঠ শেষে গৃহস্থালীর কাজে হাত দেন।

ফজরের (ভোরের) নামাজের পর সবাই যার যার কাজ শুরূ করেন– গৃহিণীরা গৃহস্থালীর কাজ, ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়, চাকুরেরা নিজ নিজ চাকরি এবং শ্রমিকেরা যার যার কারখানায় কাজ শুরূ করেন। দৈনন্দিন কাজের কোনরকম ব্যাঘাতই রমজান মাসে ঘটে না, বরঞ্চ সবাই নতুন উদ্যমে যার যার কাজ করে যান।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মিনার থেকে ধ্বনিত হয় মাগরিবের আজান এবং এই আজানের ধ্বনিই রোজা ভঙ্গ করার সঙ্কেত। রোজা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়। সাধারণত সামান্য একটু পানি খেয়ে দু-চারটে খেজুর অথবা অন্য কোন ফল অথবা যার যেমন অভিরুচি কিছু খেয়ে রোজা ভঙ্গ করা হয়। রোজা ভঙ্গ করার পর ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয় এমন খাদ্য সামগ্রী অথবা পানীয় ইচ্ছামত খাওয়া যায়।

ইফতারি যথেষ্ট কষ্ট করে তৈরি করা হয়। বিশেষ ধরনের খাবার যেমন তেঁতুলের চাটনি, বড়া, ছোলা সেদ্ধ, মাংসের কাবাব, মিষ্টি ইত্যাদি ইফতারির জন্য প্রিয় খাদ্য। রমজান মাস যদি গ্রীষ্মকালে পড়ে, তাহলে ইফতারিতে নানা রকম শরবৎ তৈরি করা হয়।

ইফতারির পর মাগরেবের নামাজ পড়া হয়। এরপর রাতের খাওয়ার সময় হয়। রাতের খাওয়া শেষে এশার নামাজ পড়ার সময় হয়। এই নামাজের সঙ্গে তারাবীর নামাজও পড়া হয়। এর পর ঘুম। এই ভাবে রমজান মাসের ২৯ অথবা ৩০ দিন কাটে। ২৯ দিনের পর যদি অমাবস্যা হয় তাহলে আরো একদিন রোজা রাখতে হয় এবং ঠিক ৩০ দিনের রোজা করতে হয়। নতুন চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঈদউল ফিতরের আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় এবং এই সঙ্গে শেষ হয় রমজান মাস। ঈদউল ফিত রের অর্থই হল রোজা শেষে আনন্দের দিন।

নতুন চাঁদ দেখার পরের দিন অর্থাৎ ঈদের দিনটি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। সকল মুসলমান ঐদিন যার যার সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরে মসজিদে অথবা ঈদগায় অথবা কোন উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হন ঈদের নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে। ফজরের নামাজ ও জোহরের নামাজের মাঝে ঈদের নামাজ পড়া হয়। নামাজ শেষে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন এবং ঈদ মোবারক জানান।

ঈদউল ফিতর শি শুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। চাঁদ দেখামাত্র তারা পরের দিন কোন কাপড়টি পরবে তা ঠিক করতে শুরু করে দেয়।

সাধারণত ঈদউল ফিত রে সবাইকে, বিশেষ করে ছোট ছেলে মেয়েদের নতুন জামা কাপড় দেওয়া হয়। চাঁদ দেখার পর প্রতিটি মুসলমানের গৃহ আনন্দোৎসবে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঈদের চাঁদ ওঠার পর ওই রাতে প্রায় প্রতিটি দোকান সারারাত খোলা থাকে যাতে সবাই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারে এবং যথাযোগ্যভাবে ঈদের উৎসব পালন করতে পারে। ওই রাতে যে যত দেরিতেই ঘুমোতে যাক, ঠিক ভোরে উঠবেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বরঞ্চ বড়দের আগেই ওঠে। বড়দের স্নান শেষ হওয়ার আগেই ছোট ছেলেমেয়েরা কাপড়-চোপড় পরে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে কখন বড়দের সঙ্গে মসজিদে অথবা ঈদগায় যাবে। শিশুদের আনন্দ-উত্তেজনার আরো একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে ঐদিন তাদের হাতে ঈদী হিসাবে অল্প কিছু টাকা অথবা পয়সা দেয়া হয়। এ টাকা পয়সা তারা ফিরতি পথে খেলনা, বেলুন বা মিষ্টি ইত্যাদি কিনে শেষ করে। এরপর তারা গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। হয়তো গুরুজনরা তাদের হাতে আরো কিছু ঈদী দেন এবং মিষ্টি খেতে দেন। ঈদের দিনে বিশেষ ধরনের সুস্বাদু খাবার রান্না করা হয়। সেমাই ও ফিরনি এ দিনের দু'টি অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এছাড়া পোলাও-কোর্মাকাবাব ইত ্যাদি নানারকম সুখাদ্যও রান্না করা হয়। ঈদের দিনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও মুসলমানদের সঙ্গে ঈদের উৎসবে যোগ দেন।

ঈদউল ফিত রের দু'মাস নয় দিন পর ঈদউজ জোহা পালিত হয়। এই সময় যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা মক্কায় হজ্জ পালন করতে যান। এই ঈদে মুসলমানগণ যার যেমন সাধ্য কোন প্রাণী আলাহ্‌র নামে কোরবানি করেন। যে ঘটনাকে স্মরণ করে এই কোরবানি করা হয় তা হচ্ছে– আলাহ্‌র প্রতি হযরত ইব্রাহিমের (রাঃ) ভক্তি ও বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য আলাহ্‌ তাঁকে তাঁর পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দিতে বলেন। ইব্রাহিম আলাহ্‌র ইচ্ছা পালনের জন্য স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে যখন কোরবানি দিতে উদ্যত হন, ঠিক সেই মুহূর্তে আলাহ্‌র ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়। কোরবানির এই মহৎ আদেশ পালনই ঈদউজ- জোহার মূল উদ্দেশ্য।

ঈদউল ফিত রের মত এই ঈদেও বিশেষ নামাজ পড়া হয় এবং নামাজের পর কোলাকুলি করে ঈদ মোবারক জানানো হয়। এরপর যার যেমন সাধ্য কোন প্রাণী কোরবানি করে সেই মাংস প্রধানত দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করেন। এই ঈদের অপর নাম কোরবানির ঈদ।

এ ছাড়ারও আরো একটি ঈদ আছে তা হচ্ছে ঈদই মিলাদুননবী। এই দিন হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম দিবস পালিত হয়।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথম প্রকাশ: *ভারত বিচিত্রা*, আগস্ট, ১৯৮৩

শচীন দেববর্মণ

বাংলা গানের কিংবদন্তীতুল্য ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শচীন দেববর্মণ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর কুমিল্লার চর্থা (অধুনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া)য় কুমার বাহাদুর নব দ্বীপচন্দ্র দেববর্মণের প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। এস ডি বর্মণের গানের আবেদন তাঁর শ্রোতাদের কাছে গত একশো বছরেরও কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। প্রিয়জন ও বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন শচীনকর্তা। কেবল সংগীতশিল্পী হিসেবে নয়, গীতিকার হিসেবেও তিনি সার্থক। বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পুত্র রাহুল দেববর্মণও ছিলেন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক ও সুরকার। তাঁর ছাত্রী এবং পরবর্তীকালে সহধর্মিণী মীরা দেববর্মণও গীতিকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় মাণিক্য রাজ পরিবারের সন্তান শচীন দেববর্মণের সংগীতে হাতেখড়ি পিতা নবদ্বীপচন্দ্রের কাছে। নবদ্বীপচন্দ্র ছিলেন সেতারবাদক এবং ধ্রুপদী সংগীতশিল্পী। মা মণিপুরি রাজবংশের মেয়ে নিরুপমা দেবী। তৎকালীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার রাজপরিবারের নয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এরপর তাঁর সংগীত শিক্ষা চলে ওস্তাদ বাদল খাঁ এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। ধ্রুপদী সংগীতের এই শিক্ষা তাঁর মধ্যে সংগীতের মৌলিক জ্ঞান সঞ্চারে গভীর ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনের সুরসাধনায় বি শেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি ওস্তাদ আফতাবউদ্দিন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯২২ সালে আইএ পাস করে একই কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। এরপর ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাশে ভর্তি হন।

১৯১০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠাকুরপাড়ার *সুরলোক*, কান্দিরপাড়ের *সবুজ সংঘ নাট্যদল*, *দি গ্রেট জার্নাল থিয়েটার পার্টি*, *ইয়ংম্যান্স ক্লাব* ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল কুমিল্লার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ত্রিপুরার মহারাজারা কুমিল্লায় তৈরি করেন টাউন হল, নাট্যশালা, লাইব্রেরি এবং নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ১৯২০ সালের দিকে শচীন দেবের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, সমরেন্দ্র পাল, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলবালা দাম, ধ্রুপদীয়া সৌরেন দাশ, সুধীন দাশ প্রমুখ। সেখানে নিয়মিত আসতেন চলচ্চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, ননী মজুমদার, ব্রজেন ব্যানার্জি, জিতু দত্ত, অরুণ মহলানবিশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৯২৩ সালে *আকাশবাণী* কলকাতা কেন্দ্রে শচীন দেববর্মণ প্রথম গান করেন। তিনি কুমিল্লা থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতা চলে আসেন ১৯২৫ সালে। ১৯৩১ সালে পিতা নবদ্বীপচন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী। শচীন দেব তখন থাকতেন কলকাতার ত্রিপুরা প্যালেসে। *সরগমের নিখাদ* নামে আত্মজীবনীতে শচীন দেববর্মণ লিখেছেন: 'পিতার মৃত্যুর পর আমি যেন অগাধ জলে পড়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমি আগরতলা বা কুমিল্লা গিয়ে থাকলে রাজকীয় আরামে ও নিশ্চিন্তে নিজেদের বাড়িতে বাস করতে পারতাম এবং রাজ্য সরকারের কোন উচ্চপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। আমার বড় ভাইরা আমাকে তাই করতে বললেন। আমার কিন্তু এ ব্যবস্থা মনঃপূত হল না। নিজে একলা সংগ্রাম করে, নিজে উপার্জন করে সংগীত সাধনায় জীবন কাটিয়ে দেব– মনের মধ্যে একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতার ত্রিপুরা প্রাসাদ ছেড়ে ভাড়া করা সামান্য একখানা ঘরে আমার আস্তানা বাঁধলাম।'

১৯৩২ সালে তিনি এইচএমভির গায়ক প্যানেলে অডিশন দিয়ে ফেল করেন। তবে সে বছরই তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয় হিন্দুস্তান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস থেকে। শচীন দেবের প্রথম রেকর্ডকৃত দুটি গান হল পল্লীগীতির ঢঙে গাওয়া 'ডাকিলে কোকিল রোজ বিহানে', গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং খাম্বাজ ঠুমরি অঙ্গের রাগপ্রধান 'এ পথে আজ এসো প্রিয়', গীতিকার শৈলেন রায়। তিরিশের দশকে তিনি রেডিওতে পল্লীগীতি গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পূর্ব বাংলা এবং উত্তরপূর্ব বাংলার পল্লীগীতির ওপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল।

১৯৩৪ সালে অল ইন্ডিয়ান মিউজিক কনফারেন্সে তিনি গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ঠুমরি পেশ করে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকে মুগ্ধ করেন। কবি জসীমউদ্‌দীনকে দিয়ে শেখ ভানুর রচনা 'নিশিথে যাইয়ো ফুলবনে' দেহ ও সাধনতত্ত্বের গানটিকে প্রেমের গানে রূপান্তর করে তিনি রেকর্ড করেন ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর সংগীত শিক্ষার্থী মীরা দাশগুপ্তকে বিয়ে করেন। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কমলনাথ দাশগুপ্তর নাতনী মীরা ছিলেন তাঁর সংগীত জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী। বাংলা গানের জগতে মীরা দাশগুপ্ত তথা মীরা দেববর্মণ অন্যতম সার্থক গীতিকার। তাঁর লেখা গানের মধ্যে আছে 'শোন গো দখিন হাওয়া', 'বিরহ বড় ভাল লাগে', 'সুবলরে বল বল', 'বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে', 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া'। ১৯৩৭ সালে *রাজগী* নামে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে শচীন দেববর্মণের সংগীত পরিচালনা জীবনের শুরু। ১৯৭১ সালে লেখা 'তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বিশেষ অবদান রাখে।

১৯৩৩ থেকে '৭৫ পর্যন্ত দীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছরের সংগীতজীবনে তিনি অসংখ্য গানে সুর করেছেন। মুহম্মদ রফি, লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত, হেমন্তকুমার, কিশোরকুমার, মান্না দে, আশা ভোঁশলে প্রমুখ তাঁর সুরে গান করেছেন। শামসাদ বেগম, মুকেশ, তালাত মাহমুদও তাঁর সুরে অনেক গান করেছেন। তিনি নিজেও ১৪টি হিন্দি ও ১৩টি বাংলা সিনেমার গানে কণ্ঠ দিয়েছেন।

জীবনভর নানা সম্মাননা লাভ করেছেন এই সংগীতগুণী। ১৯৫৮ সালে ভারতের সংগীত নাটক একাডেমি এবং এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি লন্ডন থেকে সম্মাননা লাভ করেন শচীন দেববর্মণ। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৫ সালে প্যারালিটিক স্ট্রোক হয়ে পাঁচ মাস কোমায় থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বাংলার এই জনপ্রিয় ও অতিশয় গুণী সংগীতপ্রতিভা মুম্বইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪
গুলশান১, ঢাকা১২১২

বাড়ি ২৪, সড়ক ২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা১২০৫

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আইজিসিসি মিলনায়তনে অমিত চৌধুরীর ভরতনাট্যম ও সুইটি দাসের মণিপুরী নৃত্য পরিবেশনা

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আইজিসিসি মিলনায়তনে ফিরোজা বেগমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ড. নাশিদ কামালের নজরুল সঙ্গীত শ্রদ্ধাঞ্জলি
১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আইজিসিসি মিলনায়তনে শম্পা দাসের নজরন্নল সঙ্গীত পরিবেশনা

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আইজিসিসি মিলনায়তনে শান্তিনিকেতনের স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চকবির রচিত সঙ্গীত পরিবেশনা
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ কলকাতার দেবারতি গোস্বামী ও তার দলের ওড়িশি নৃত্য পরিবেশনা

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভারতের শংকরী মৃধা ও তাঁর দুই সহযোগী স্বর্ণকলি কুণ্ডু ও লিসা চট্টোপাধ্যায়ের ভরতনাট্যম পরিবেশনা
২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সন্তোষকুমার মিশ্রর সঙ্গীত পরিবেশনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra October 2015

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএস্থির সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল, নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট) ॥ উল্লেখ্য, এসব এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৮. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল ইমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই মেইলসমূহ: ০৯৮৯০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০৯৮ ৯০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০৯৮৯০১৭১৩ ৩৮ ৯৪৯৯ ০৯৮৯০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত